মায়াবতী পথে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি-এম্ লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৫৮

সাড়ে তিন টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা—৬, ডি-এম্ লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রাকর: শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, ৮৯, লেক রোড, কলিকাতা—২৯, প্রচ্ছদপট শিল্পী: শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লক: ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও।

মায়াবতী পথে

এই লেখকের বই—

স্মৃতিকথা—১ম পর্ব…৩৷৷০
স্মৃতিকথা—২য় পর্ব…৩৷৷০
অমলা (২য় সংস্করণ)…৩৷০
অভিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)…৫৲
অনুরাগ (২য় সংস্করণ)…৪৷৷০
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)…৪৷০
বিদুষী ভার্যা (৩য় সংস্করণ)…৩৷০
যৌতুক (২য় সংস্করণ)…২৷৷০
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)…৪৷৷০
নাস্তিক …৩৲
মায়াবতী পথে …৩৲
রাজপথ (৫ম সংস্করণ)…৪৲
ছদ্মবেশী (৩য় সংস্করণ)…৩৲
অমূলতরু (৩য় সংস্করণ)…৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)…৪৷৷০
আশাবরী (২য় সংস্করণ)…৪৲
রাতজাগা (২য় সংস্করণ)…১৷০
রাজপথ (নাটক)…২৲
কমিউনিষ্ট প্রিয়া…২৸০
নবগ্রহ …১৷০
বৈতানিক …১৷০
গিরিকা …১৷৷০
ভারতমঙ্গল (নাটিকা)…১৷০

দেশবন্ধুপত্নী দেশবরেণ্যা
শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর
করকমলে

পূর্ব কথা

চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে মায়াবতী যাত্রার বিচিত্র কাহিনী 'মায়াবতী পথে' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জনের অনিচ্ছা ও নিষেধ বশতঃ কিছু কিছু কাহিনী, যথা তাঁহার দানশীলতার প্রসঙ্গাদি, তখন ব্যবহার করিতে পারি নাই; অথচ চিত্তরঞ্জন-চরিত্রের মহানুভাবতার আলোকপাত করিবার দিক দিয়া ঐ কাহিনীগুলি অমূল্য। তাই, নারায়ণে প্রকাশিত লেখাকে মাত্র কাঠামো করিয়া পূর্ণতর ভাবে এবং নূতনতর ভঙ্গীতে মায়াবতী পথের কাহিনীগুলি সম্প্রতি ধারাবাহিক ভাবে 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম।

'গল্প-ভারতীতে' প্রকাশিত কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

৪৬-৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী
১৭ মাঘ, ১৩৫৮

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়াবতী পথে

১

১৯১৫ সালের জুলাই মাস হইতে ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে বিখ্যাত লছমীপুর কেস আরম্ভ হইয়াছে। মকদ্দমার দাবি সমগ্র লছমীপুর স্টেটের স্বত্বাধিকার লইয়া। কোর্ট-ফিস্ এবং জুরিস-ডিক্‌শনের জন্য মকদ্দমার মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে চল্লিশ লক্ষ টাকা, কিন্তু বহু মূল্যবান খাদ-খনি-পাহাড়-পর্বত-অরণ্যানী সমাকীর্ণ সুবিস্তৃত জমিদারীর প্রকৃত মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশি। মকদ্দমার বিচার্য ইসুর সংখ্যাও চল্লিশ।

ইসু ধার্যের সময়ে বিবাদী পক্ষে, অর্থাৎ রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে, আসিয়াছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ভারতবিখ্যাত অ্যাডভোকেট ডক্টর (পরে স্যার) রাসবিহারী ঘোষ। শুনানির সময়ে আসিয়াছেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদী পক্ষের ব্যবহারজীবিগণের শীর্ষস্থানে আছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার, চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ সহোদর, প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ মিঃ. পি. আর. দাশ) এবং স্যার (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পক্ষে বড়-ছোট-মাঝারি দলের দশ-বার জন করিয়া স্থানীয় উকিল আছেন। যে আকাশে চিত্তরঞ্জন প্রদীপ্ত চন্দ্রমা, আমি হচ্ছি

সেই আকাশের একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা,—অর্থাৎ বছর আড়াইয়ের একজন জুনিয়ার উকিল।

এজলাসে মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্বে বৎসর দুই-আড়াই ধরিয়া উভয় পক্ষে কমিশনের সাহায্যে বহু সাক্ষীর জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না যে, ১৯১৫ সালের লছমীপুর কেস মামলা-মকদ্দমার ইতিহাসে একটি রাজসূয় যজ্ঞ। ভাগলপুরের বিহারী অধিবাসিগণের মধ্যে মামলা জগতে এই বিরাট যজ্ঞটি 'সিংহ ঔর শিয়ারকা লড়হাই' (সিংহ ও শিয়ালের যুদ্ধ) নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সিংহ অর্থে বাদীপক্ষে স্যার এস. পি. সিংহ, এবং শিয়ার অর্থে বিবাদী পক্ষে মিঃ, সি. আর. দাশ। শেষ পর্যন্ত কিন্তু শিয়ালের নিকট সিংহকেই পরাজিত হইতে হইয়াছিল। মামলায় বিবাদী পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যেও এই মকদ্দমার নামকরণ লইয়া বেশ একটি কৌতুকাবহ যোগাযোগ দেখা দিয়াছিল। বাঙ্গালীরা লছমীপুর মকদ্দমার নাম রাখিয়াছিল নাতি-মাতামহর মামলা। এ নামেরও সহিত বাদী-বিবাদী পক্ষের আত্মীয়তাগত কোনো যোগ ছিল না, উভয় পক্ষের কৌন্সিলের সম্পর্ক ধরিয়াই এই নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। নাতী অর্থে স্যার এস. পি. সিংহ, এবং মাতামহ অর্থে মিষ্টার সি. আব. দাশ। বস্তুত, উভয়ের মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও এ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার স্বপক্ষে একটি অকাট্য যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জনের ডাক-নাম ছিল ভোম্বল, উপাধি ত দাশ বটেই। আর, সিংহের মামা যে ভোম্বল দাশ, এ কথা বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। সেই সূত্র অনুযায়ী চিররঞ্জন, অর্থাৎ ভোম্বল দাশ হইলেন স্যার এস. পি. সিংহের মাতুল। ইহার পর মাতুলের পিতা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মাতামহ না হইবার উপায় ছিল না।

২

চিত্তরঞ্জনের ভাগলপুরে অবস্থানের জন্য লছমীপুর-রাজ বিহারের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা পরলোকগত দীপনারায়ণ সিংহের সুবৃহৎ এবং সুরম্য বৈঠকখানা-বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই গৃহে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে বাস করিতেছেন। গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং পুষ্পোদ্যান , তাহার অব্যবহিত দক্ষিণে ক্লীভল্যাণ্ড রোড, ভাগলপুরের পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী দীর্ঘতম রাজপথ, ভাগলপুর শহরের মেরুদণ্ড; গৃহের অব্যবহিত উত্তরে কলস্বনা পূর্ববাহিনী ভাগীরথী নদী। তাহার উত্তরে দিগন্তবিস্তৃত চরভূমি। এবং তদুত্তরে ভাগলপুর হইতে বোধ করি দশ মাইল দূরে দিগ্বলয়, অর্থাৎ আকাশ এবং ধরিত্রীর মিলনরেখা।

চিত্ত এবং চক্ষু—উভয়ের আনন্দদায়ক এই পরম রমণীয় পরিবেশের মধ্যে আমাদের প্রত্যহ সকাল এবং সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া বৈঠক বসিত। সকালে বসিত লছমীপুর মামলা সংক্রান্ত আইন এবং এজাহার বিচারের পরামর্শ-সভা ; এবং সন্ধ্যায় সাহিত্য এবং সঙ্গীত আলোচনার স্পৃহনীয় আসর। যুক্তি এবং তর্কের নির্মম পাথরে শাণিত হইয়া যে সকল নিষ্ঠুর অস্ত্র সকালের মন্ত্রণা-সভায় প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বারা আদালতের এজলাস-রূপ রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করিয়া বৈকালে দাশসাহেব গৃহে ফিরিতেন কবি এবং সাধারণ ভদ্রলোকের নিশ্চিন্ত চিত্ত লইয়া। পিছনে পড়িয়া থাকিত আইন এবং আদালত। সেদিনের মতো লছমীপুর মকদ্দমার বিবাদলক্ষ্মী খেকয়ার কারাগারে প্রবেশ করিয়া বীফ্ এবং নথিপত্রের সহিত বন্দী হইতেন ; তৎপরিবর্তে সান্ধ্য সভায় অবতরণ করিতেন সাহিত্য এবং সঙ্গীতের কলালক্ষ্মী। চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি যাহাকে সকাল এবং সন্ধ্যার উভয় বৈঠকে হাজিরা দিতে হইত ;—সকালে ব্যারিস্টার দাশ

সাহেবের জুনিয়াররূপে মন্ত্রণা-সভায়, সন্ধ্যাকালে কবি চিত্তরঞ্জনের সুহৃদরূপে শিল্প-মজলিসে।

এইরূপে আইন এবং এজাহার, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে দিনগুলি আলোড়িত হইতে হইতে অবশেষে আসিয়া পড়িল অক্টোবর মাসের প্রারম্ভকাল,—অর্থাৎ শারদীয় পূজার সুদীর্ঘ তেত্রিশ দিনের ছুটি।

ছুটি হইবার কিছু পূর্ব হইতে মনের মধ্যে দেশ ভ্রমণের একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল। আলিপুরের উকিল বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথা ছিল, ছুটি হইলে কলিকাতায় গিয়া কোনো একটা স্থান নির্বাচিত করিয়া লইয়া উভয়ে মিলিয়া ভ্রমণে নির্গত হওয়া যাইবে। যথা-সময়ে বন্ধুবরের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে নোটিসও পাইলাম। কিন্তু ছুটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, সমস্যা ততই জটিলতর হইতে আরম্ভ করিল। সংশয়পীড়িত মনের মধ্যে কে যেন থাকিয়া থাকিয়া বলে, কোথায় যাই, কোথায় যাই! সিমলা পাহাড় হইতে শ্রীযুক্ত মেজদাদার আহ্বান আসিয়াছে। কয়েকজন বন্ধু দার্জিলিঙ যাইবার কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত দার্জিলিঙ যাইবার কথাও চলিতেছে। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন, সর্বপ্রথম কলিকাতায় যাইতেই হইবে। তথায় উপস্থিত হইয়া একটা বিষয়ের অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহার পর কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার কথা।

সিমলা অবশ্য আমার খুব ভাল লাগে। সিমলার কথা মনে হইলেই মনের মধ্যে বিরাট ও মধুরের এক অপূর্ব চিত্র ফুটিয়া উঠে, যাহার আকর্ষণ কোনোদিনই মন্দীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মহাকায় দৈত্যের মতো বড় বড় নগ্ন পাহাড়ের লাফালাফি করিয়া আকাশের দিকে অগ্রসর হইবার সমারোহ সিমলা শহর হইতে দু-চার মাইল উত্তরে গেলে যেমন দেখা যায়, হিমালয়ের আর কোনও অঞ্চলে তেমন দেখা যায় কি-না সন্দেহ।

তথাপি, সিমলা কয়েকবারই গিয়াছি। দার্জিলিঙ দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনের গোপন প্রদেশে লুকাইয়া বাস করিতেছে। বাঙলা দেশ হইতে সহস্রাধিক মাইল দূরে হিমালয়ের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সিমলা কয়েকবারই আমাকে টানিয়া লইয়া গেল, অথচ বাঙলার শীর্ষদেশে অবস্থিত এক রাত্রির পথ দার্জিলিঙ এ পর্যন্ত দেখা হইল না, ইহা শুধু দুঃখেরই নহে, লজ্জার কথাও বটে। শুনিয়াছি দার্জিলিঙ হিমাচ্ছন্ন, কুয়াশাময়, কুজ্‌ঝটিকার প্রহেলিকায় রহস্যাবৃত। না দেখিয়া দেখিয়া, এবং দেখিবার একটা তীব্র বাসনা মনের মধ্যে সজাগ রাখিয়া, আমার মানস-দার্জিলিঙকে বাস্তব-দার্জিলিঙ অপেক্ষা বোধ করি দশগুণ রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছি। মনে করিতেছিলাম কলিকাতায় গিয়া বন্ধুবরকে সম্মত করিয়া লইয়া এবার পূজার অবকাশে দার্জিলিঙ-এর রহস্যগুণ্ঠন উন্মোচিত করা যাইবে, এবং তদনুযায়ী মনে মনে প্রস্তুতও হইতেছিলাম, এমন সময়ে আর একবার সেই মহাসত্য উপলব্ধি করিবার কারণ ঘটিল, জীবনের মধ্যে যাহা বহুবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এবং বহুবার করিতে হইবে। অর্থাৎ, "Man proposes and God disposes,"—ভারতবর্ষের ভাষায়, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'। দার্জিলিঙ্‌ যাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে বাস্তবতার প্রদীপ্ত রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে সহসা অপ্রত্যাশিত এক পক্ষ কর্তৃক অচিন্তিত একদিকের জন্য প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলাম।

ছুটি হইতে তখনো দিন দুই বাকি। আদালত খোলার পর নবোদ্যমে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কি উপায়ে সাঙ্ঘাতিক আক্রমণ চালাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রভাতকালের মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে, এমন সময়ে গেট অতিক্রম করিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির ক্ষুদ্রতার অনুপাতেও ঘোড়া দুইটি কিছু বেশি ক্ষুদ্র এবং শীর্ণ। রাজপথে হয়ত কতকটা দৌড়িয়াই আসিয়াছিল, কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিন্তু তাহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া

গিয়াছে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কৌতূহলের সময়কে দীর্ঘতর এবং মাত্রাকে উচ্চতর করিতে করিতে ধীরে ধীরে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোচমানের হয়ত ইচ্ছা ছিল কতকটা দৌড়াইয়া আসিয়া অকস্মাৎ রাশ কষিয়া থামিয়া মর্যাদা রক্ষা করে, কিন্তু তাহার মৌখিক উৎসাহ এবং চাবুকের আস্ফালনকে অটুট দার্শনিক ঔদাস্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া ঘোড়া দুইটি শেষ পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াই বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইল।

এমন ধীর মন্থরগতি গাড়ির মধ্যে বসিয়া কে আসিতেছে জানিবার কৌতূহলে ক্ষণিকের জন্য কাজকর্ম বিরতিলাভ করিয়াছিল। কোচবাক্স হইতে ক্ষিপ্রবেগে অবতরণ করিয়া কোচমান গাড়ির দরজা খুলিয়া একটি ব্যাগ এবং পথে ব্যবহারের উপযোগী একটি লঘুভার বিস্তারা (বেডিং) নামাইয়া রাখিল। তৎপরে গাড়ির ভিতর হইতে অবতরণ করিলেন মধ্যযৌবনবয়সের এক ভদ্রব্যক্তি; পরিধানে খদ্দরজাতীয় সাদা মোটা কাপড়ের ধুতি, পিরান এবং উড়ানি; মাথায় সেই সাদা কাপড়ের ইঞ্চিচারেক কানা উঁচু টুপি; পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। নিষ্ঠাপূত গোলগাল মুখাবয়বে সহৃদয়তার প্রসন্নমধুর দীপ্তি, এবং সাজ-সজ্জার সাদাসিদা সাত্ত্বিক পদ্ধতি দেখিয়া সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়।

বারান্দায় উঠিয়া ভদ্রলোক চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এঞ্জিন থামিলে পিছনের গাড়ি সকলও যেমন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যায়, তেমনি দাশ সাহেব থামার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও থামিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই, দাশ সাহেব এবং তাঁহার সদ্যাগত অতিথির প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন আমাদের আর বেশি কিছু করিবার ছিল না। সহসা এক সময়ে লক্ষ্য করিলাম, আমার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া চিত্তরঞ্জন যেন কিছু বলিতেছেন, এবং তদুত্তরে আমাকে দেখিতে দেখিতে আগন্তুক উৎসাহ

এবং সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতেছেন। সন্দেহ হইল আমার বিষয়েই হয়ত কোনো আলোচনা হইতেছে।

ক্ষণকাল পরেই সন্দেহের নিরসন হইল। আমার নিকট উঠিয়া আসিয়া আগন্তুক বলিলেন, "উপেনবাবু, নমস্কার। অনুগ্রহ করে একটু একান্তে আসবেন ?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "নমস্কার। আপনি ?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি গণেন ব্রহ্মচারী। সম্প্রতি মায়াবতী থেকে আসছি।"

বলিলাম, "সৌভাগ্যের কথা,—সকালবেলা সাধু সন্দর্শন হ'ল, দিন ভাল যাবে। এতদিন নামের সঙ্গেই পরিচয় ছিল, আজ সাক্ষাৎ দর্শন পেলাম। কি আদেশ বলুন ?"

গণেন মহারাজ বলিলেন, "আদেশ নয়, অনুরোধ। একটু একান্তে যদি আসেন।"

বারান্দার একপ্রান্তে গিয়া রেলিং-এর ধারে দুইজনে দাঁড়াইলাম।

গণেন মহারাজ বলিলেন, "মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ স্বামীজী আমাকে পাঠিয়েছেন। পূজার ছুটিটা মায়াবতীতে গিয়ে কাটাবার জন্যে আমি মিস্টার দাশকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছি, আপনাকেও করছি। আপনাকে আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনে উপেন বাবু, নিশ্চয়ই আপনাকে যেতে হবে।"

যাঁহারা আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন সেই 'আমরা' যে কাহারা এবং সেই 'আমরা'র সহিত মায়াবতীনিবাসী প্রজ্ঞানন্দ স্বামীজীর যে কোনো সংশ্রব থাকিবার কথা নহে, সেটুকু বুঝিবার পক্ষে অনুমান শক্তির আমার অভাব হইল না। একবার ইচ্ছা হইল, এ সম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করি। কিন্তু সকালবেলা একজন সাধুব্যক্তিকে অনাবশ্যক জেরার দ্বারা বিপন্ন করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতে মন চাহিল না। তাঁহার সদয় প্রস্তাবের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া

দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম যে, মায়াবতী যাইবার কল্পনা যৎপরোনাস্তি লোভনীয় হইলেও সে লোভের হস্ত হইতে আমাকে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে, যে হেতু আমি অন্যত্র অপরের কাছে চুক্তিবদ্ধ।

আমাকে চুক্তি-ভঙ্গ করিতে সম্মত হইবার জন্য ক্ষণকাল নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া গণেন মহারাজ তাঁহার তৃতীয়-ব্যক্তিহীন 'আমরা'র প্রধান ব্যক্তির হস্তে আমার মায়াবতী যাওয়া-না-যাওয়ার সমস্যা অর্পণ করিয়া চা-পানাদি করিবার আহ্বানে প্রস্থান করিলেন। এ কথা বোধ করি না বলিলেও চলে যে, গণেন মহারাজের দ্বি-বচনিক 'আমরা'র অপর এবং প্রধান ব্যক্তি হইতেছেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের পাল্লায় পড়িয়া আমার সঙ্কল্পের নৌকার বানচাল হইতে খুব বেশি বিলম্ব হইল না।

চিত্তরঞ্জনের সহিত যাঁহারা কিছুকাল একত্রে বাস করিয়াছেন অথবা কাজ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, চিত্তরঞ্জনের পালা শক্ত পাল্লা। সঙ্কল্পকে সিদ্ধিতে পরিণত করিবার জন্য যখন তিনি বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁহার দ্বারা প্রাপনীয় কোনো শক্তিকেই প্রয়োগ করিতে তিনি বিরত থাকেন না,—ইংরেজি ভাষার উপমায়, কোন পাথরকেই উল্টাইতে বাকি রাখেন না। মকদ্দমায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্যবসায়গত অপরিমেয় শক্তির সহিত মক্কেলের দ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করাইয়া দৈবশক্তির যোগসাধন করাইতেও দেখিয়াছি। বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হইলেও, এই সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ গল্প বলিলে বোধ করি সময়ের নিতান্ত অপব্যবহার হইবে না। গল্পটি লছমীপুর মকদ্দমারই অন্তর্গত একটি ঘটনা।

বিবাদী পক্ষের জবাবের (written statement) বিশেষত্ব হেতু মকদ্দমার সর্বপ্রধান বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ-ভার (onus) পড়িয়াছিল বিবাদীর উপর। সুতরাং আইনত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকেই প্রথমেই বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সুদীর্ঘ দেড়মাসকাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা

চলিয়া চলিয়া অবশেষে তার চরম প্রান্তে আসিয়া ঠেকিল কোনো-এক বুধবারে। স্বাভাবিক ভাবে দাশ সাহেব যদি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন তাহা হইলে অপর পক্ষ বুধবারেই বক্তৃতা আরম্ভ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু বাদী পক্ষকে বৃহস্পতিবারের অশুভক্ষণে আরম্ভ করাইতে পারিলে দৈবকেও তাহাদের প্রতিকূল করানো যায়, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উপসংহার-ভাগকে টানিয়া টানিয়া বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ণে লইয়া আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া বারবেলার ঠিক প্রাক্কালে সহসা ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিতান্ত অন্তরঙ্গ আমরা দু-চার জন চিত্তরঞ্জনের গুপ্ত মতলবের কথা অবগত ছিলাম। আমরা ভাবিলাম, অপরপক্ষের অজ্ঞাতসারে বেশ সাঙ্ঘাতিক এক চাল চালা গিয়াছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সে ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। চিত্তরঞ্জনের দুরভিসন্ধির বিষয়ে অপর পক্ষে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন আসন গ্রহণ করিবামাত্র তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "আমি আজ আমার বক্তৃতা আরম্ভ করব না ;—কাল করব।"

তখনো কাজ করিবার মতো আদালতের ঘণ্টা দেড়েক সময় বাকি ছিল। ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

স্যার সত্যেন্দ্র বলিলেন, "মিস্টার দাশ অনায়াসে গত কাল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারতেন। শুধু আমাকে বৃহস্পতিবারের বারবেলার অশুভক্ষণে আরম্ভ করাবার জন্যে পুনরাবৃত্তির দ্বারা অনেকক্ষণ টেনে টেনে তিনি দুদিন বক্তৃতা চালিয়েছেন। আমি কিছুতেই বৃহস্পতি-বারের বারবেলায় আরম্ভ করব না।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে এজলাস-ঘর চকিত হইয়া উঠিল। দেখা গেল, শুধু চিত্তরঞ্জনেরই উপর নহে, বৃহস্পতিবারের বারবেলার সংস্কার স্যার সত্যেন্দ্রের উপরও সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে।

চিত্তরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর উক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "মনে রাখতে হবে এটা বিয়ে, পৈতে অথবা শ্রাদ্ধের মতো কোনো ধর্মানুষ্ঠান নয়। এটা ইংরেজের আদালতে দস্তুরমতো আইন-নজিরের দ্বারা পরিচালিত মকদ্দমা; এখানে হাঁচি, টিক্‌টিকি, বারবেলার ওজর-আপত্তির স্থান নেই।"

স্যার সত্যেন্দ্র বলিলেন, "সেই কথা মনে রেখে বন্ধুবর যদি কাল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন তা'হলে ত কোনো গোলই থাকত না। তা' ছাড়া, এখন যদি তিনি তাঁর মকদ্দমার অপরাজেয়তা সম্বন্ধে আরও আধঘণ্টাটাক বক্তৃতা ক'রে আসন গ্রহণ করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করব, এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তিনি বারবেলায় শেষ করলে বারবেলায় আরম্ভ করতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি আশা করি আমার এ প্রস্তাবকে আদালত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব ব'লে বিবেচনা করবেন। কিন্তু একেবারে বারবেলার কিনারায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে তিনি যদি আমাকে বারবেলার নিষিদ্ধ সলিলে ঠেলে ফেলতে চান, তা হলে নিশ্চয় আপত্তি করব।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

বারবেলায় স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে আরম্ভ করানো সম্ভব হইবে না বুঝিয়া চিত্তরঞ্জন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন; বলিলেন, "স্যার সত্যেন্দ্র যদি নিজের সুবিধা মতো সময়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবার বিলাস উপভোগ করতে চান, তা'হলে তাঁকে সে বিলাস অর্থ দিয়ে খরিদ করতে হবে। আদালতে প্রতিদিন কম-বেশি পাঁচ ঘণ্টা করে মকদ্দমা চলে। এই পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আমার মক্কেলকে নিত্য যে মোটা টাকা ব্যয় করতে হয়, তার অনুপাতে দেড় ঘণ্টায় যে টাকা দাঁড়ায় সেই টাকা তাঁকে আমাদের খরচা বাবদ দিতে হবে।"

উত্তরে স্যার সত্যেন্দ্র বলিলেন, "দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হিসেব করতে হবে। কালকের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে

অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা, আর আজকের সাড়ে তিন ঘণ্টা, মোট সাত ঘণ্টা সময় বন্ধুবর অপব্যয় করেছেন শুধু আমাকে বারবেলার *মধ্যে ছেড়ে দেবার সদুদ্দেশ্যে। সুতরাং আমি এই সাত ঘণ্টার* খেসারৎ পাবার অধিকারী। আদালতের পাঁচ ঘণ্টার জন্য আমার মক্কেলের দৈনিক যে টাকা ব্যয় হয়, তার অনুপাতে সাত ঘণ্টার মূল্য নিরূপণ করলে দেখা যাবে আমার প্রাপ্য টাকা বন্ধুবরের প্রাপ্য টাকাকে পাঁচ-ছবার গিলে খাবার উপযুক্ত।"

পুনরায় একটা হাসির রোল উঠিল।

বিচারক ছিলেন মৌলভি বেদার বখ্ৎ, বর্ধমান নিবাসী বাঙালী ভদ্রলোক, বৃহস্পতিবারের বারবেলার রহস্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। চিত্তরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সহাস্য মুখে বলিলেন, "যে-রকম দেখা যাচ্ছে, বারবেলায় আরম্ভ করতে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে কিছুতেই রাজি করানো যাবে না। সুতরাং কাল এগারটায় আবার মিলিত হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। আর, খরচার কথায় এ কথা আপনিও স্বীকার করবেন মিস্টার দাশ, পাঁচ-ছবার না হোক, স্যার সত্যেন্দ্রের প্রাপ্য টাকা অন্তত একবার আপনার প্রাপ্য টাকাকে গিলে খাবার উপযুক্ত, সুতরাং খরচার টাকা গায়ে গায়ে শোধ।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে পেশকারের সহিত বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারবেলা লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন দুর্ধর্ষ বাঘা-ভালুক ব্যারিস্টারের এইরূপ ছেলেমানুষী দেখিয়া আমরা সেদিন যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

সকালবেলার বৈঠক ভাঙ্গিলে চিত্তরঞ্জন ইসারায় আমাকে নিকটে ডাকিলেন। কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, "রাজী ত ?"

বুঝিতে বাকি ছিল না, তথাপি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "কিসে ?"

"মায়াবতী যাওয়ায় ?"

একটু ইতস্তত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, "আপনি ত জানেন—

কথা শেষ করিতে না দিয়া চিত্তরঞ্জন হাসিমুখে বলিলেন, "হাঁ, আমি জানি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। না গেলে প্রত্যবায়ের দায়ী হবেন।"

হাসিয়া বলিলাম, "কিসের প্রত্যবায়?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "আমাদের আনন্দের মূলে খানিকটা কুঠারাঘাত করার।"

এতবড় কথার বিরুদ্ধে কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। "আচ্ছা, দেখি।" বলিয়া চিন্তিত মনে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম।

বিপদ দেখিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। দেখিলাম, খুব নিরাপদ স্থলে ব্রীফ্ প্রদান করি নাই, অপর পক্ষের কেস্ খুব জোরালো বলিয়া তাঁহার ধারণা। কিন্তু যতই হউক, রমণীহৃদয় ত, আমার কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া আমার আরজি চিত্তরঞ্জনের নিকট পেশ করিলেন।

ধৈর্যসহকারে সমস্ত কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এ ত ভাল কথা। রোগিনী যখন রোগমুক্ত হয়েছেন, তখন ত তাঁর চেঞ্জই দরকার। আমাদের টুরিস্টকার ত হাওড়া থেকে আসবেই, উপেনবাবু কলকাতায় গিয়ে বউমাকে টুরিস্টকার ক'রে নিয়ে আসুন।"

বাসন্তী দেবী বলিলেন, "দুর্বল শরীর, এতটা পথশ্রম সইবে কি?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "টুরিস্টকারে জার্ক ত একেবারেই নেই, ঘরের মতোই আরামে আসবেন।"

বাসন্তী দেবী বলিলেন, "কিন্তু কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী, সাত-আট দিনের পাহাড়ে পথ?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কাঠগুদাম পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি সবল হ'য়ে যাবেন। যদিই বা কিছু দুর্বলতা থাকে, পাহাড়ের হাওয়া লেগে দেখতে দেখতে তা লোপ পাবে। আর পাহাড়ে পথের কথা বলছ?

পাহাড়ে পথের যা-কিছু দুঃখ তা ত ডাণ্ডীওয়ালা কুলির। ডাণ্ডীতে যে চ'ড়ে যায় সে ত পাহাড়ের উপর দিয়ে যায় না, হাওয়ার উপর দিয়ে যায়। ইচ্ছাসুখে চলা,—কষ্ট যদি একান্তই হ'ল, ডাণ্ডী থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম, হয় ত বা একটু কিছু খেয়েও নিলাম,—তারপর তাজা হ'য়ে নিয়ে আবার দুলতে দুলতে ভেসে চললাম।"

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম, দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। আজ দেখিলাম, মহাত্মারও নাই। বাসন্তী দেবী পরাজয় স্বীকার করিলেন। যতটা সহজে করিলেন, তত সহজে আমরা করিলে আমাদের মক্কেলরা আমাদের সততার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়।

দিন দুই পরে বলিলাম, "মায়াবতীই যাচ্ছি।"

হর্ষোজ্জ্বল মুখে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "ভালো কথা। তা হলে কলকাতায় যাচ্ছেন কবে ?"

বলিলাম, "আর যাচ্ছিনে।"

"কেন ? বউমাকে মায়াবতী নিয়ে যাবেন না ?"

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা করিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, উপস্থিত অবস্থায় বিশ্রামই বোধ হয় তাঁর পক্ষে শ্রেয়।"

এ কথার প্রতি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এজলাসে চিত্তরঞ্জন সিংহবিক্রমে সাক্ষীকে পরাজিত করিতেন; তাঁহার জ্বলন্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া সাক্ষী বাপের নাম ভুলিত। আদালতের বাহিরেও চিত্তরঞ্জন ছিলেন অপরাজেয়; কিন্তু সেখানে প্রতিপক্ষ বাপের নাম না ভুলিলেও আর সকলই ভুলিত।

৩

সমস্যা সমাধানের একটা আরাম আছে। মায়াবতী যাওয়ার কথা ওঠার পর কয়েক দিন ধরিয়া মনটা একটা বিরক্তিকর অনিশ্চয়তার ধূসর মেঘে মলিন হইয়াছিল, মীমাংসার বায়ু প্রবাহিত হওয়ামাত্র মেঘ অপসৃত হইয়া সমস্ত মন আগ্রহ এবং প্রত্যাশার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মায়াবতী। মায়াবতী! মায়াবতী!

সুদূর হিমালয়ের নিভৃত নিরালায় অবস্থিত মায়াবতীর শুধু চিন্তার মধ্যেই যথেষ্ট মাদকতার হেতু বর্তমান। তাহার উপর নাম পর্যন্ত মায়াবতী! অচেনা, অজানা, অদেখা মায়াবতীর নীলাভ মায়ার কল্পনায় উৎসুখ মন ময়ূরের মতো পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল! দার্জিলিঙ তাহার দুর্ভেদ্য কুজ্‌ঝটিকার রহস্যজাল লইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং চুক্তিভঙ্গ অপরাধের যে কুণ্ঠার চেতনা কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত মনকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে ভাঁটা ধরিল।

বন্ধু শ্যামরতনকে মনে মনে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, তোমার আকর্ষক শক্তিকে অস্বীকার করি না। কিন্তু তুমি আছ দুই শত পঁয়ষট্টি মাইল দূরে কলিকাতায়, আর তোমার প্রতিযোগী শক্তি অবস্থান করিতেছে অর্ধ মাইল দূরে ভাগলপুরে। তুমি যদি গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, দুইটি সমমাত্রিক শক্তি কোনো বস্তুকে দুই বিপরীত দিক হইতে আকর্ষণ করিলে তাহারা তাহাদের দূরত্বের একটা বিশেষ বিপরীত হিসাবে আকর্ষণ করে। তদুপরি, নিকটবর্তী শক্তিটি যদি দূরবর্তী শক্তি

হইতে প্রবলতর শক্তি হয়, তাহা হইলে যে ব্যাপার দাঁড়ায়, সে কথা না উত্থাপন করাই ভাল।

এইরূপ যুক্তি বিবেচনার দ্বারা মনকে কতকটা হাল্‌কা করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে দাশসাহেবের গৃহে নিয়মিত বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, আবহাওয়া যেন একটু ভারি। অর্থাৎ, ক্ষণকাল পূর্বে সেখানকার আকাশে যেন এমন একটা কোনো ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে যাহার শেষ বাষ্পরেখা বায়ুমণ্ডল হইতে তখনো সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করে নাই।

কৌতূহল অনুচিত, অনুসন্ধিৎসা ত অমার্জনীয়। সুতরাং সাধারণ কথার অবতারণা করিলাম।

সাধাবণ কথাব প্রসঙ্গকে সংক্ষেপে শেষ করিয়া বাসন্তী দেবী আসল কথা পাড়িলেন; বলিলেন, "যোগ্য পাত্রে দান করা ভাল কাজ, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু পাত্র যখন অসত্য কাহিনীর সাহায্যে করুণা জাগিয়ে ঠকিয়ে নেয়, সে দানের অর্থ থাকে কি ?"

বুঝিলাম, কোন্ পাথরের ঠোকাঠুকিতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। একটা মাঝামাঝি ধরণের উত্তব দিয়া সকল দিক যথাসম্ভব বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "থাকলেও সে অর্থ বোঝা শক্ত!"

বাসন্তী দেবী বলিলেন, "না, অর্থ থাকেই না।" তৎপরে আসল কথাটি খুলিয়া বলিলেন।

সকালের ট্রেনে এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে আসিয়া দুঃখ এবং বিপদের একটা হৃদয় বিদারক কাহিনী বিবৃত করিয়া বিগলিতচিত্ত চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে একটা মাঝারি অঙ্কের মোটা অর্থ আদায় করিয়া সন্ধ্যার গাড়িতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ভদ্রলোক-কথিত কাহিনী যে বস্তুতঃ এ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই, তাহা একমাত্র চিত্তরঞ্জন ভিন্ন অপর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন,—এমনই অসঙ্গত এবং পরস্পরবিরোধী উপকরণের দ্বারা সে কাহিনী গঠিত।

হঠাৎ একসময়ে দেখিলাম, দূর হইতে চিত্তরঞ্জন আমাদিগকে দেখিতেছেন, এবং বুঝিতেছেন, কি প্রসঙ্গ আমাদের মধ্যে চলিয়াছে।

সুযোগ মিলিতে বিলম্ব হইল না। এক সময়ে আমাকে একান্তে পাইয়া অল্প একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "বাসন্তীরা মনে করে ভগবান বুঝি বুদ্ধি শুধু ওদেরই দিয়েছেন, আমাকে দেন নি। আমিও বুঝি, ভদ্রলোক সম্ভবত মিথ্যা কাহিনী ব'লেই আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গেল। বিপদ কোথায় জানেন? বাসন্তীরা এইখানেই দাঁড়ায়, আর এগোয় না। আচ্ছা, সহজে কি কোনো ভদ্রলোক নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পরকে ঠকিয়ে টাকা নেয়? কত প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে লোকে ও-কাজ করে, তা ত কেউ ভেবে দেখবে না! ওরা ঠকানোটাই দেখবে। কিন্তু ঠকানোটাই কি সব? অভাবটা কিছুই নয়?"

কিছু পূর্বে বাসন্তী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'ওরূপ দানের অর্থ থাকলেও তা বোঝা শক্ত'। এখন অর্থের মহিমা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অপরূপত্ব দেখিয়া খুশি হইয়া মনে মনে যুক্ত করে বলিলাম, প্রণাম! অপরাধকে মার্জনা করিবার এ কি অদ্ভুত সহজ এবং সরল পদ্ধতি! ক্ষমার গৌরবের পার্শ্বে বিচারের মাহাত্ম্য ম্লান হইয়া গেল।

বলিলাম, "সে ভদ্রলোক আপনাকে ঠকিয়ে গেছেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আপনি যে আমাদের সকলকে ঠকিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।"

আমার কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন মনে মনে হাসিয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "একটু গান হোক না?"

সঙ্গীত সেখানকার প্রায় নিত্যকরণীয় ব্যাপার; বিশেষ করিয়া সেদিনের পক্ষে ত তাহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলাম, "আপত্তি নেই।"

উচ্চকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন আদেশ করিলেন, "বদরি, হারমোনিয়ম দিয়ে যা।"

চিত্তরঞ্জনের সর্দ্দার ভৃত্যের নাম বদরি।

হারমোনিয়ম আসিলে ষ্টপ খুলিয়া প্রথমে সুর টিপিলাম, তাহার পর সুর বন্ধ করিয়া বলিলাম, "কি গাব বলুন।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "যা আপনার ইচ্ছে।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংশোধিত করিয়া লইয়া, যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই বলিলেন, "ধিনতা ধিনা গান।"

অনেক গানই তিনি আমার কাছে শুনিতেন,—মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত গানও। কিন্তু বিশেষ করিয়া দুইটি গান ছিল তাঁহার যৎপরোনাস্তি প্রিয়,—'ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা।' এবং 'মনেরই বাসনা শ্যামা।' 'মনেরই বাসনা' গানটি শুনিতে শুনিতে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে,—ইহা কয়েক দিনই দেখিয়াছি।

'ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা' গানের দ্বিতীয় ছত্র হইতেছে—'মনে করেছিস ধরবি আমায়, আমি বন্ধনদশায় থাক্‌ব না'। চিত্তরঞ্জন প্রায়ই বলিতেন, "ধিনতা ধিনা গানটা শুনতে শুনতে আমার মন একটা বেপরোয়া ছন্দে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার একটা চমৎকার ভঙ্গি ঐ গানটার মধ্যে আছে।"

মনে মনে আমি বলিতাম, "বুঝেছি, মনের মধ্যে বাঁধন ছেঁড়ার হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। ভৈরব ভেরী বেজেওঠবার আর বেশি দেরিনেই।"

গান আরম্ভ করিতে গিয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তী দেবী প্রভৃতি সকলেই চতুর্দিকে আসিয়া জমিয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে আসিয়াই সংসারের আকাশে যে বাষ্পজাল দেখিয়াছিলাম, বুঝিলাম তাহার নিরবশেষে নিশ্চিহ্ন হইতে আর বিলম্ব নাই।

গানের পালা শেষ হইলে ডাক পড়িল আহারের টেবিলে। বাসন্তী দেবীর আহার টেবিলের মেনু নিত্যই বিচিত্র এবং লোভনীয় হইয়া

থাকে—আজও হইয়াছিল। আহার চলিবার কালে এক সময়ে লক্ষ্য করিলাম, চিত্তরঞ্জন গল্প করিতেছেন বেশি, খাইতেছেন কম। এরূপ ব্যাপার আজই যে প্রথম লক্ষ্য করিলাম তাহা নহে, পূর্বেও বহুবার দেখিয়াছি; শুধু যে আহার্যের পরিমাণই তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহা নহে, মেনুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও রসনাতৃপ্তিকর বস্তটাই হয়ত বাদ দিয়া যাইতেছেন। আমার মনে হইত এরূপ তিনি করিতেন, লোভ সংবরণ করিবার একটা অনুশীলন ক্রিয়া হিসাবে। পেশী পুষ্ট এবং কঠিন করিবার জন্য লোকে যেমন ডন-বৈঠক করে, মুগুর ভাঁজে, এ-ও কতকটা সেইরূপ। হয়ত' মনে করিতেন, পরস্পর-সংযুক্ত বস্তু-নিচয়ের এক প্রান্তে একটা ঠেলা দিলে সে ঠেলা যেমন আপনাআপনি অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক সেই রূপে, বহিরিন্দ্রিয়ের উপর একটা সংরোধ স্থাপন করিতে পারিলে সে সংরোধও হয়ত কোনএক সময়ে অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর সংক্রান্ত হইতে পারে। রসনাই যদি আয়ত্তের বাহিরে রহিল, মন বশীভূত হইবে কি করিয়া?

আপাতদৃষ্টিতে এ সকল কথা অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে; কিন্তু সামান্য একটি ছিদ্রপথে চক্ষু রাখিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে যেমন দেখিয়া লওয়া যায়, মানুষকেও তেমনি অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সামান্যতম একটা কার্য অথবা আচরণের মধ্য দিয়া। যে প্রক্রিয়া বলে আজ হইতে পাঁচ বৎসর পরে একটি ভোগীর আবরণ ভেদ করিয়া এক যোগীর উদ্ভব হইয়াছিল, বুঝিলাম সেই প্রক্রিয়ার আদি পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। ভোগের অসারতার সার হইতে ত্যাগের বীজাঙ্কুর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে।

রাত্রি বেশি হইলে আমার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের সময়ে চিত্তরঞ্জন প্রায়ই মোটারকার দিতেন। কোনোদিন লইতাম, কোনোদিন লইতাম না। সেদিন দিতে চাহিয়াছিলেন কি-না মনে নাই, কিন্তু একথা স্পষ্ট মনে আছে, দিতে চাহিলেও লই নাই। নানান্ দিক হইতে নানান্ রাগিণী

আহরণ করিয়া কুহকিনী চিন্তা মনের মধ্যে যে অশ্রুতপূর্ব গুঞ্জন তুলিয়াছিল, মোটারকারের দ্রুতগতিতত্ত্বের মধ্যে তাহাকে হারাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। নিঃসঙ্গ নির্বাধ ছিলাম বলিয়া পথ হাঁটিবার প্রলোভন আরও প্রবল হইয়াছিল।

ক্লীভল্যাণ্ড রোডে পড়িয়া পূর্ব মুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার গন্তব্য স্থান খঞ্জরপুর, রাত্রি সাড়ে দশটার স্নিগ্ধ নির্জনতার অঙ্কে বিছানো মাইল খানেকের উঁচুনীচু পথ। তরুণ অক্টোবরের তারকা-খচিত হৈমন্ত রাত্রি। হিসাব মতো তরুণ অক্টোবর শরৎকাল হইলেও ভাগলপুরাদি পশ্চিমাঞ্চলে শরতের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কুজ্‌ঝটিকার উত্তরীয় পরিধান করিয়া হেমন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। সরকারদের বাড়ি, বাঙালিটোলার চৌমাথা, ভাগলপুর ইন্‌স্টিটিউট্‌, সি-এম্‌-এস্‌ স্কুল, রাজা শিবচন্দ্রের গৃহ, বর্দ্ধমান রাজার কুঠি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া কমিশনার সাহেবের বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের উত্তর প্রান্তে পৌঁছিলাম। এই স্থান কতকটা 'No man's land'-এর মতো; না এ-পাড়া, না ও-পাড়া; না আদমপুর, না খঞ্জরপুর।

হঠাৎ মনে পড়িল চিত্তরঞ্জনের সিদ্ধিভেদী অতিথির কথা। সিদ্ধি ভেদ করিয়া এতক্ষণে হয়ত' তিনি তিনপাহাড় ছাড়াইয়া চলিয়াছেন।

শাস্ত্রমতে তাঁহাকে অতিথি বলা নিশ্চয়ই চলে; কারণ কোনো তিথি নির্ধারিত করিয়া তিনি আসেন নাই এবং একদিনের অধিক অবস্থানও করেন নাই। কিন্তু অতিথিই হউন, অথবা আর-যাহাই হউক, তিনি যে 'কাবিল আদমি' তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এক বেলাতেই কার্যোদ্ধার।

সাহেবগঞ্জে ডালপুরি ও মিঠাইয়ের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া এতক্ষণে তিনি বোধহয় বাঙ্কের উপরের নিরাপদ অঞ্চলে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়াছেন। মাথার তলায় ক্ষুদ্র সুটকেশ; তাহার ভিতরে অনর্থের মহৌষধ সেই অর্থ, যাহা তাঁহার কলিকাতায় সংসার-ক্ষুধের

[illegible], ক্ষান্ত হইয়া আপাততঃ যাহা থাকিয়া গিয়াছে, যাবৎকটা [illegible] করিতে পারিবে।

আচ্ছা, টাকা যথার্থত কাহার? যে উপার্জ্জন করে তাহার, না, যে ঠকাইয়া লয় তাহার? মনে মনে মাথা নাড়িয়া চিত্তরঞ্জনের অতিথি হয়ত' ভাবিতেছেন, যে ঠকাইয়া লয় তাহারও সব সময়ে নহে; যে ঠকাইয়া খায় তাহার। চলিষ্ণু টাকাকে ভোগের দ্বারা যে অচল করে সে-ই টাকার যথার্থ মালিক; অপর সকলে ভারবাহী। সেইজন্য চার্বাকের মতো দার্শনিক ব্যক্তি ভারবাহীগণের নিকট হইতে ঋণ লইয়া ঘৃত পানের উপদেশ দিয়াছেন। ঘৃত পানই হইতেছে টাকার চরম সার্থকতা, তা সে ঘৃত-পান ঋণ লইয়াই হউক, অথবা ঠকাইয়াই হউক। ঋণ লওয়া ও ঠকাইয়া লওয়া অনাত্মীয় বস্তু নহে; এক মায়ের দুই পুত্র না হইলেও, তাহারা দুই মাসীর দুই পুত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান লোকেরা ঋণ লয়, চতুর লোকেরা ঠকাইয়া লয়।

এ সকলই ঠিক, তথাপি বিবেকের মধ্যে কে যেন এক-এক সময়ে ছুঁচ ফোটায়। তন্দ্রা আসিতে আসিতে চটকা ভাঙিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় দর্শনের সত্যানুসন্ধায়ী দৃষ্টির সহায়তা লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অদ্বৈতবাদের স্থূল কথা হইতেছে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। চিত্তরঞ্জনের অতিথি হয়ত' সেই অদ্বৈতবাদ-জগতের ছালার মধ্যে যাবতীয় বস্তু এবং প্রাণী, কার্য এবং কারণ, পুরিয়া লইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তবে আর আমার অপরাধ কোথায়? যে গল্প ফাঁদিয়া টাকা আদায় করিয়াছি, সে গল্প যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে যে টাকা আদায় করিয়াছি, সে টাকাও ত মিথ্যা! শুধু তাহাই নহে, আমিও মিথ্যা, চিত্তরঞ্জনও মিথ্যা; একমাত্র ব্রহ্ম সত্য। অথবা হয়ত' তিনি সকৃতজ্ঞ মনে বারংবার চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, হে বহুরূপী নারায়ণ, তোমাকে শত নমস্কার! বুঝিয়াও তুমি দিতেছ, সে কথা

বুঝিয়াই আমি লইয়াছি। তুমি এতো মহৎ যে, কুণ্ঠা তোমার কাছে হার স্বীকার করে।

হয়ত' বা এধরণের কোনো চিন্তাই তিনি করিতেছেন না,—কারণ, তাঁহার সংসারের যে চিত্র এখানে তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি রেখাও মিথ্যার তুলি দিয়া অঙ্কিত নহে। নিছক সত্যের মধ্য দিয়া দুঃখ-লাঘবের যে স্বল্পতম ব্যবস্থাটুকু করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে ক্ষরিত নিষ্কলুষ নিশ্চিন্ততার আরামে তিনি হয়ত' এখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

বাম দিকে সৌরেন সিংহের বিরাট অট্টালিকা 'ঝাউয়া কুঠি'—সমগ্র বিহারের মধ্যে বাঙালির বৃহত্তম বাসভবন। সম্মুখে আমাদের গৃহ। আসিয়া পড়িয়াছি।

লোহার ছিটকানি উল্টাইয়া গেট ঠেলিয়া যখন কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতেছি, তখন গৃহের ক্লক-ঘড়িতে এগারটা বাজিতেছে।

৪

মায়াবতী-যাত্রীর দলে আমরা ছিলাম সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ জন প্রাণী। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী অপর্ণা ও শ্রীমতী কল্যাণী কন্যাদ্বয়, পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জন (ভোম্বল), চিত্ত-রঞ্জনের আত্মীয় এবং ল-ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সেন, বাসন্তী দেবীর সম্পর্কীয় ভ্রাতা শ্রীমান টগর এবং আমি। এই আট জনের অতিরিক্ত আরও ছিল ছয় জন অর্থাৎ, একজন আয়া, এবং পাচক ও ভৃত্য মিলিয়া পাঁচ জন।

যাত্রা পর্বের উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে প্রচুর আনন্দ এবং উত্তেজনার একটা কারণ দেখা দিয়াছিল। ভাগলপুর হইতে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের বেরেলি ষ্টেশন পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের অতি-ক্রমণীয় মোট রেল পথের যতখানি অংশ ব্রড্‌গেজ ততখানি, ই-আই রেলওয়ের একখানা টুরিষ্ট কার ভাড়া করিয়া ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এই ব্যবস্থার কথা মনে করিয়া উত্তেজনার একটা দস্তুরমতো জোরালো প্রবাহ আমাদের চৌদ্দজন যাত্রীরই মধ্য দিয়া সমান বেগে বহিয়াছিল। কারণ, টুরিষ্ট কারে ভ্রমণ করিবার সুযোগই বলি, অথবা সৌভাগ্যই বলি, আচিত্তরঞ্জন-আয়া পর্যন্ত সকলের পক্ষেই এই প্রথম। কিচেন-বাথটব-বৈঠকখানা-ভৃত্যশালা সমন্বিত সকল প্রকার সুখ-সুবিধা-আরামের চরমতম আশ্রয়, রেল কোম্পানীর রাজকীয় ব্যবস্থা, টুরিষ্টকার রূপ সঞ্চরমান গৃহে চড়িয়া যথাসময়ে স্নান-আহার-নিদ্রা সম্পাদনের দ্বারা রেল যাত্রার অনিবার্য দুঃখ-গ্লানিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ভ্রমণের কল্পনাবিলাসে সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

বস্তুত টুরিষ্টকার ব্যাপারটাকে উত্তেজনাজনক মনে করিবার পক্ষে আরও কয়েকটি গুরুতর কারণের কথা শুনা গিয়াছিল। ভ্রমণ করিবার কালে হঠাৎ যদি খেয়াল হইল, কোনো ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন তথায় বাস করিয়া যাইব, শুধু সময় মতো গার্ডকে অথবা ষ্টেশন মাষ্টারকে সে অভিপ্রায়টুকু জানাইবার ওয়াস্তা,—অমনি যথাস্থানে ট্রেণ হইতে টুরিষ্ট কারটি কাটিয়া লইয়া একটি নিস্তব্ধ সাইডিং-এ রাখিয়া দিতেই হইবে। তাহার পর যে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করি, দৈনিক ষোল টাকা ভাড়া হিসাবে কিছু অতিরিক্ত অর্থ ফেলিয়া দিলেই হইল।

চক্ষু যাহাতে ধূলি-কয়লার দ্বারা পীড়িত না হয়, এবং আলোক ও বায়ু যাহাতে তাহাদের ইচ্ছামতো মাত্রায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া অসুবিধা ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্য জানালায় জানলায় পঞ্চবিধ উপায়ের ব্যবস্থা। প্রথমত, ধূলি, কয়লা, ধূম, আলোক ও বায়ুকে বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য কাঠের নিশ্ছিদ্র কবাট; তাহার পর আলোকের পথ অবারিত রাখিয়া ধূলি, ধূম, কয়লা ও বায়ুকে নিবারিত করিবার জন্য সাদা কাঁচের শার্শি; কিন্তু শুভ্র প্রখর আলোক চক্ষুর পক্ষে যদি পীড়াদায়ক মনে হয়, সে অবস্থার জন্য আছে রঙিন কাঁচের শার্শি; যদি ইচ্ছা হইল, আলোক ও বায়ু নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ভিতরে প্রবেশ করুক, অথচ ধূলি ও কয়লা বাহিরে আটকাইয়া থাকুক, তাহার জন্য আছে উৎকৃষ্ট ধাতু নির্মিত সূক্ষ্ম তারের জাল; সর্বশেষে আছে হাল্কা বেগুনি রঙের মূল্যবান রেশমের স্ক্রীন, ব্যবহারিক উপকারিতার দিক দিয়া ইহার ততটা মূল্য না থাকিলেও, অভিধা হিসাবে ইহার সার্থকতা আছে। টানিয়া প্রসারিত করিয়া দিলে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া পত-পত শব্দের দ্বারা ইহা বলিতে চাহে, আমি পতাকা,—যে ব্যয়সাধ্য অভিজাত সৌখীনতার মধ্যে তোমরা বন্দী হইয়া চলিয়াছ, আমি তাহার প্রতীক।

এরূপ কথাও শুনা গিয়াছিল যে, কক্ষের যে-কোনো স্থানেই বসা যাক না কেন, দক্ষিণে বামে হাত বাড়াইলে যে দিকেই হউক, একটা-না-একটা বাদামি রঙের মসৃণ বোতাম হাতে ঠেকিবেই, এবং সেই বোতামটায় একটু চাপ দিলেই কয়েক মুহূর্ত পরে ভৃত্যশালা হইতে ভৃত্য উপস্থিত হইয়া বলিবে, 'হুজুর'।

ইহার পরও যদি কাহারও মনে উত্তেজনার সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শোনিতে তাহার রক্ত কণিকার লাঘব ঘটিয়াছে।

সৌভাগ্য কদাচিৎ সুলভ হয়। প্রত্যাশার আলোকোজ্জ্বল আকাশে সংশয়ের ঘন মেঘ দেখা দিল। বাস্তবতায় পরিণত না হইয়া টুরিষ্টকার বুঝি শেষ পর্যন্ত স্বপ্নেই মিলাইয়া যায়!

সময়ের স্বল্পতাবশত ই-আই রেল কোম্পানীর সহিত টুরিষ্ট-কারের চেষ্টা চলিয়াছিল ভাগলপুর এবং কলিকাতার মধ্যে জবাবি টেলিগ্রামের সাহায্যে। কিন্তু যখন দেখা গেল, ঐ উপায়ে সমস্ত দিক গুছাইয়া সকল ব্যবস্থা ঠিক মতো হইয়া উঠিতেছে না, তখন, মৌখিক মোকাবিলায় সকল গোলযোগ দূরীভূত হইতে পারিবে সেই আশায়, কলিকাতায় লোক পাঠানো হইল। কিন্তু স্বয়ং দৈব যখন জট পাকাইবার কৌতুক আরম্ভ করে, তখন জট ছাড়াইবার চেষ্টাও জটকে জটিলতর করিতে থাকে। যদি বা ব্যাপারখানা পূর্বে কিছুটা সরল ছিল, জট ছাড়াইবার উদ্দেশ্যে যাঁহাকে কলিকাতায় পাঠানো হইয়াছিল তাঁহার নিকট হইতে খান দুই টেলিগ্রাম পাওয়ার পর তাহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল।

অগত্যা টুরিষ্টকারের আশা পরিত্যাগ করিয়া একখানা প্রথম শ্রেণীর ক্যারেজ রিজার্ভ করিবার জন্য তার করা হইল। কিন্তু গ্রহ যখন অপ্রসন্ন হয় কোনো চেষ্টাই তখন সফল হইতে চাহে না, এক ব্যর্থতা অপর ব্যর্থতাকে হাত ধরিয়া সঁপিয়া দিয়া যায়।

৭ই অক্টোবর সমস্ত দিন ধরিয়া কলিকাতা হইতে রেল কোম্পানী ও আমাদের লোকের দ্বারা প্রেরিত যে কয়খানি দুর্বোধ্য এবং পরস্পর অসংলগ্ন টেলিগ্রাম আসিল, আহারের পর রাত্রি দশটার সময়ে সকলে মিলিয়া সেগুলির অর্থ সমন্বয় করিবার জন্য বসা গেল। সুদীর্ঘ আলোচনা এবং বিচার বিতর্কের ফলে এইটুকু স্পষ্ট হইল যে, ফার্স্ট ক্লাস ক্যারেজের রিজার্ভ পাওয়া যাইবে না, টুরিষ্টকার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কবে, কোথায় এবং কোন্ ট্রেণের সহিত, তাহা অনিশ্চয়তার কুজ্ ঝটিকার মধ্যে তখনো অস্পষ্ট।

পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া টুরিষ্টকারের নিষ্ফল চেষ্টা করিতে করিতে সকলের মন বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় তাহার পশ্চাতে সময় অতিবাহিত করিবার মতো ধৈর্য কাহারও ছিল বলিয়া মনে হইল না। মন তখন বাহির হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তা সে যত বড় অনিশ্চয়তা এবং অসুবিধার মধ্য দিয়াই হউক না কেন। কবি ওমর বলিয়াছেন, 'মাত্রা যখন পুরিয়া উঠে তখন মিষ্টই-বা কি, আর তিক্তই বা কি!' আমাদেরও আগ্রহের মাত্রা যখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ফার্স্ট ক্লাসই বা কি, আর থার্ড ক্লাসই বা কি, রিজার্ভ পাইলেও চলে, না পাইলেও ক্ষতি নাই।

স্থির হইল, পরদিন প্রাতে ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার টুরিষ্টকারের সংবাদ লইয়া সম্ভাবনার মতো কিছু না দেখিলে আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া অপরাহ্নের ট্রেনে কিউল পর্যন্ত যাওয়া, ইত্যবসরে কিউল হইতে বেরেলি পর্যন্ত একটি ফার্স্ট ক্লাস ক্যারেজ রিজার্ভ পাইবার জন্য কলিকাতা ও সাহেবগঞ্জে টেলিগ্রাম করা; রিজার্ভ পাওয়া যায় উত্তম, অন্যথা কিউলে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে কোনো প্রকারে স্থান করিয়া লইয়া মোগলসরাই পেঁছানো; তৎপরে বেরেলি হইতে কাঠগুদাম পর্যন্ত মিটারগেজ রেলে রিজার্ভ পাইবার জন্য

একটি জরুরি তার করিয়া আউধ-রোহিলখণ্ডের ট্রেনে কোনো প্রকারে আরোহণ করতঃ বেরেলিতে পেঁাছিয়া অবতরণ; তথায় রিজার্ভ পাওয়া যায় উত্তম; অন্যথা মিটারগেজের গাড়িতে কোনো প্রকারে *মাথা গলাইয়া প্রবেশ করিয়া তৃতীয় দিবসের প্রত্যূষে কাঠগুদামে* উপনীত হওয়া।

মাল-পত্র এবং হাত-পা লইয়া কোন মতে একবার কাঠগুদামে পেঁাছাইতে পারিলেই হইল; তাহার পর হইতে ভ্রমণ ব্যবস্থার যাহা কিছু চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তা, তাহা আমাদের নহে, মায়াবতীর কর্তৃপক্ষের। তাঁহাদের আতিথ্য হিমালয়ের নব্বই মাইল পথ গড়াইয়া কাঠগুদামে আসিয়া আমাদের পর্বতারোহণের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবে, তাঁহাদের নিকট হইতে এই আশ্বাস আমাদের পাওয়া আছে।

সে যাহাই হউক, ভাগলপুর হইতে কাঠগুদাম পর্যন্ত ভ্রমণ-ব্যবস্থার উল্লিখিত পরিকল্পনাটি সকলে মিলিয়া মাথা ঘামাইয়া রচিত করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেল। আশ্চর্য! এমন একটি সরল ও সর্বাঙ্গসুন্দর ভ্রমণ-পদ্ধতির অবসর থাকিতেও কয়েকটা দিন আমরা টুরিষ্টকার রূপ মরীচিকার পিছনে অকারণ সময় নষ্ট করিয়াছি ভাবিয়া অপ্রতিভ হইলাম। এ ব্যবস্থার সর্বপ্রধান সুবিধা এই যে, মধ্যপথে কোনো স্থানে গাড়িতে উঠিতে না পারার জন্য পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা থাকিলেও, ভাগলপুরে বসিয়া থাকিবার দুর্ভাগ্য নাই। 'বাঁচি ত' উত্তম, অন্যথা এ প্রাণ ত্যাগ করিব' যে বলে সে ব্যক্তি মরিয়া; আর উঠি ত' উত্তম, অন্যথা পড়িয়া থাকিব' যে ভাবে সে বেপরোয়া। বেপোরোয়া হইবার একটা সুমিষ্ট অহঙ্কারের চেতনায় আমরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই বেশ একটু গরম হইয়া উঠিলাম! ভব-সংসারের যৎপরোনাস্তি অনিশ্চয়তার যাত্রাপথে কোনো সুযোগ সুবিধা রিজার্ভ না করিয়াও দৃঢ়পথে আগাইয়া চলিয়াছি, আর ভাগলপুর হইতে কাঠগুদাম এই কয়েক শত মাইলের সামান্য পথের কথা ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইব?

পরদিন প্রাতে ষ্টেশন হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়া শ্রীমান চিররঞ্জন জানাইলেন, টুরিষ্টকার যথাপূর্ব স্বপ্ন হইয়াই অবস্থান করিতেছে—বাস্তবতার রূপ ও রঙ ধারণ করিবার কোনো লক্ষণ আপাতত তাহার নাই।

তখন অপরাহ্ণ তিনটার গাড়িতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল।

৫

প্রধান শিবির চিত্তরঞ্জনের বাসস্থান হইতে 'ডেরাডাণ্ডা' তুলিয়া এতক্ষণে সকলে নিশ্চয়ই ভাগলপুর রেল-ষ্টেশনে পেঁাছিয়াছেন। আমি কিন্তু যাত্রাপর্বের সামান্য উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যেই পিছাইয়া পড়িয়াছি। সাজ-সজ্জা পরিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সেনাপতি অশ্বারোহণ করিয়াছে, পদাতিক কিন্তু পাগড়ি বাঁধিতেই ব্যস্ত। শয্যা এবং সুটকেস লইয়া স্টেশন যাইবার জন্য যখন ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলাম, তখন ট্রেন পেঁাছিবার মাত্র মিনিট পাঁচিশেক বাকি।

পাঁচিশ মিনিটে, এমন কি তদপেক্ষা কিছু কম সময়েও, খঞ্জরপুর হইতে সুজাগঞ্জের রেল-স্টেশনে পেঁাছানো অসম্ভব নহে,—কিন্তু গতি যদি দ্রুত, এবং পথ যদি অবাধ হয়, তবেই। দৈবক্রমে কোনো একটা আটক ঘটিলে পাঁচিশ মিনিটের মধ্যে তাহার ভুক্তান হওয়া কঠিন। ট্রেন মিস্ করিবার দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলাম।

মনের কম্পাস-কাঁটা তখন কিন্তু মায়াবতীর আকর্ষণে এমন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ট্রেন মিস্ করিলে সত্যই মনস্তাপের কারণ ঘটিবে ; অথচ দুর্নাম রটিবে, ইচ্ছা করিয়াই ট্রেন মিস্ করিয়াছি। মন যখন আশাভঙ্গের অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে, লোকে তখন বলিবে, আচ্ছা এক চাল চালিয়াছে। ইহার বাড়া দুর্ভোগ আর নাই।

এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় যাহাতে পড়িতে না হয় তজ্জন্য রথ-চালক আলিউদ্দিনকে যুগপৎ ভয় এবং প্রলোভনের দ্বারা উত্তেজিত করিয়া তুলিলাম। বলিলাম, ট্রেন যদি ফেল করাও তা হ'লে ষ্টেশনে পেঁাছানোর ভাড়া ত পাবেই না, অধিকন্তু বিনা ভাড়ায় বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথা, ভাড়ার উপর এক টাকা বকসিস।

দণ্ড এবং পুরস্কারের মারাত্মক ব্যবধান উপলব্ধি করিয়া আলিউদ্দিন তৎপর হইল। পদঘর্ষণ, জিহ্বা-চালন, এবং চাবুক-আস্ফালন,—এই

ত্রিবিধ উপায়ের যোগে এমন প্রবল বেগে রথ চালাইল যে, ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হইতে লাগিল, 'চাকা আগে ছাড়ে কিম্বা ঘোড়া আগে পড়ে'। ও-দিকে মাথার উপর তিথি অমাবস্যা ভ্রুকুটি করিয়া আছে। শেষ পর্যন্ত ফলিত জ্যোতিষ ফলিয়া গিয়া বহু-অভিজ্ঞতায়-কঠিন মনকে খানিকটা দুর্বল না করিয়া তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোড়া বহাল-তবিয়তে এবং চাকা অভগ্ন-অবস্থায় স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। বোধ-করি চাকা এবং ঘোড়া উভয়ের অবস্থাই এমন সমানভাবে শোচনীয় ছিল যে, অপরকে বজায় রাখিয়া নিজে ভাঙ্গিয়া পড়িবার প্রতিযোগিতায় কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে না পারার দরুণই এমনটা সম্ভব হইতে পারিল। আলিউদ্দিনের হাতে ভাড়া এবং বকশিস্ গুঁজিয়া দিয়া কুলির মাথায় মাল চাপাইয়া দ্রুতবেগে ওভার-ব্রিজ পার হইয়া যখন আপ্ প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিলাম, তখন হোম্ সিগ্ন্যাল ডাউন হয় নাই। ট্রেন পৌঁছিবার সময়ের তখনো মিনিট তিন-চার বাকি। দেখিলাম আমি ছাড়া আর সকলেই সময়-মত আসিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন।

ট্রেন মিস্ করিলে যে দুর্নাম রটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলাম ট্রেন মিস্ না করিয়াও তাহা হইতে ষোল আনা অব্যাহতি পাইলাম না। বক্র-কটাক্ষে আমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া বাসন্তী দেবীকে সম্বোধন করিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "উপেন বাবুর ঘড়ি কয়েকমিনিট যে ফাস্ট্ চলছে সেকথা উপেনবাবুর নিশ্চয় জানা ছিল না।"

বাসন্তী দেবী কোনো মন্তব্য করিবার পূর্বেই উত্তর দিলাম আমি, কহিলাম, "কেন বলুন দেখি ?"

"তা জানা থাকলে আরও কিছু বিলম্ব ক'রে স্টেশনে পৌঁছতেন !"

সমবেত কণ্ঠের উচ্চহাস্যে প্ল্যাটফর্মের সে অঞ্চলটা মুখর হইয়া উঠিল। যুক্ত হাস্যরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শোনা গেল স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের হাসি।

হাস্যরসিক আছে দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর হাস্যরসিকেরা অপরকে

হাসাইয়া নিজেরা নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে অবস্থান করে; অপর শ্রেণীর হাস্যরসিকেরা অপরকে হাসাইয়া নিজেরাও সে হাসিতে যোগ দেয়। চিত্তরঞ্জন ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। তিনি হাসাইতে যেমন জানিতেন, হাসিতেও তেমনি পারিতেন। সেই জন্য তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে কাঁটার আঘাত যে-পরিমাণ থাকিত, তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিত মধুর আস্বাদ।

আমার ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখা গেল আমার ঘড়ি বরং এক-আধ মিনিট স্লো চলিতেছে, কিন্তু ফাস্ট এক মুহূর্তও নহে।

বিজয়গর্বে গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "এবার তা হ'লে কি বলবেন?"

কিন্তু বলিতে যাঁহারা জানেন, বলিবার অসুবিধা তাঁহাদের কখনই হয় না। হাস্য মুখে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "বলব, আপনার নিশ্চয় ধারণা ছিল, এক-আধ মিনিট নয়, আপনার ঘড়ি দশ-বারো মিনিট স্লো চলছে।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উঠিল। এবার চিত্তরঞ্জন আরও জোরে হাসিতে লাগিলেন!

ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, 'স্লো অথবা ফাস্ট না চ'লে আমার ঘড়ি যদি একেবারে ঠিক চলত, তাহ'লে আপনি কি বলতেন?' কিন্তু কথাবার্তায় মগ্ন ছিলাম বলিয়া এতক্ষণ যাহা চোখে পড়ে নাই, সহসা তাহার উপর দৃষ্টি পড়ায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম! যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহার পাশে বেশ খানিকটা স্থান জুড়িয়া স্তূপীকৃত লগেজের রাশি, সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন; পঞ্চাশও হইতে পারে, আশী হইলেও আপত্তি নাই। তদুপরি প্যাকিং বক্সে ভরা কয়েকটি মালের আকার এরূপ বৃহৎ এবং ভারব্যঞ্জক যে, দেখিলে মন স্বতঃই পীড়িত হইতে থাকে।

মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "ও কি ব্যাপার?"

সকৌতূহলে চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ? কোথায়?"

পূর্বোক্ত লগেজ রাশির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলাম, "ঐ সব?"

বিস্মিত-কণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কেন ?—ও ত' আমাদের মালপত্র।"

সবিনয়ে বলিলাম, "তা বুঝেছি ; কিন্তু ও যদি মাল-পত্র হয়, তা হ'লে পাহাড়-পর্বত কি হবে তাই বুঝছিনে ! ঐ মাল-পত্র বহন ক'রে দুরারোহ মায়াবতী পাহাড়ে আমাদের উঠতে হবে না-কি ?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "নিশ্চয় হবে। কিন্তু আশ্বস্ত হোন, ওর একটি কণিকাও আপনাকে বহন করতে হবে না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মুখে আর কিছু বলিলাম না, কিন্তু মনের মধ্যে আশ্বস্ত হইতেও পারিলাম না। ভার যদি শুধু কাঁধই বহন করিত, তাহা হইলে ত' বিশেষ কিছু গোল ছিল না ; কিন্তু মনও যে ভার বহন করে ! অর্থের জন্য কুলিরা হয়ত' আনন্দের সহিতই ভার বহন করিবে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যদি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তাহা ঠেকাইবে কে ?

'Train in sight'-এর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পূর্বদিকে চাহিয়া দেখি কখন্ কোন্ সময়ে হোম সিগন্যাল ডাউন হইয়াছে। অদূরে সরীসৃপ-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ট্রেন আসিতেছে ! স্থান পাইবার কথা ভাবিয়া আশা এবং আশঙ্কায় আমাদের মন আলোড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল সৌভাগ্যক্রমে একটি প্রথম শ্রেণী ক্যারেজের পাশাপাশি দুইটি কামরা একেবারে খালি ! মেয়েদের প্রথমে উঠিবার সুযোগ দিয়া পরে আমরা উঠিয়া বসিলাম।

মালের কথা মনে হইতে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার,—একটি মালও তুলিতে বাকি নাই। যে বৃহৎ কুলি-বাহিনী মাল তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, নিখুঁৎ ভাবে কর্তব্য শেষ করিয়া তাহারা তখন ইনাম ও পারিশ্রমিক লইতে ব্যস্ত। মাল তুলিবার অসামান্য যোগ্যতার প্রমাণ পাইয়া কুলিদিগের প্রতি মন কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল।

৬

গাড়ি ছাড়িলে আমাদের যাত্রাপথের প্রথম সঙ্কট ভাগলপুর স্টেশনের সমস্যার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা দেখা দিল কিউল জংশনের কথা ভাবিয়া। প্রথম সঙ্কটের অন্তরালে যে দ্বিতীয় সঙ্কট অপচ্ছায়ারূপে অবস্থান করিতেছিল, আবরণমুক্ত হইয়া এখন তাহা মূর্তি গ্রহণ করিল। কিউলে শুধু যে গাড়ি বদল করিতে হইবে তাহাই নহে, আমাদের লুপ লাইনের ট্রেন কিউলে পৌঁছানো এবং মেন লাইনের হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার কিউল ছাড়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র-চব্বিশ মিনিট। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে মাল-পত্রের হিমালয় বহন করিয়া সাব-ওয়ের ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আপ প্ল্যাটফর্মে উপনীত হইয়া হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে আস্তানা গাড়াই ত' দুরূহ ব্যাপার,—তাহার উপর আমাদের মন্থরগতি ট্রেনখানি যদি দয়া করিয়া দশ-পনের মিনিট বা তদূর্ধ্বকাল আলস্যবিলাসে অপচিত করিয়া বসেন, তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না।

সময়ে সময়ে লুপ লাইনের এই ট্রেনখানি হইতে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার ধরিবার জন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইবার প্রয়োজন হয়। কখনো বা দৌড় মারিয়াও সুবিধা করিতে পারা যায় না। এ সকল দুশ্চিন্তার সহিত অপর এক দুর্ভাবনা ছিল, যদি হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে রিজার্ভ গাড়ি না আসে এবং খালি কামরাও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসম্ভব-অধিক মাল-পত্র এবং স্নায়ুহারা বিমূঢ় হাত-পা লইয়া হাঁচোড়া-পাঁচোড় করিতে করিতে কি বিপদেই না পড়া যাইবে!

একটা গল্প মনে পড়িল। মাঠ ভাঙ্গিয়া মাতা-পুত্রে গ্রামান্তরে চলিয়াছিল, জমিদার-গৃহে ভোজ লাগিয়াছে সংবাদ পাইয়া। ধনীগৃহের

লুচি-মণ্ডা-পায়স-পিঠার কথা স্মরণ করিয়া পুত্র এক সময়ে জননীকে প্রশ্ন করিয়াছিল, 'হ্যাঁ মা, বদহজম হবে না ত?' উত্তরে মাতা বলিয়াছিল, 'বাবা, আগে ভোজে ত' বোসো, তারপর বদহজমের কথা'! আমরাও উক্ত কাহিনীর সারগর্ভ নীতি-বাক্য অনুসরণ করিয়া ভাবিলাম, আগে ত' হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারের নাগাল পাই, তারপর স্থান পাইবার কথা।

ভাগলপুর ছাড়ার পর প্রতি স্টেশনেই আমরা ঘড়ি ও টাইম্ টেবিল্ মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম ট্রেন ঠিক যাইতেছে অথবা লেট্ হইতেছে। সময় তখন এমনই মূল্যবান বস্তু যে, অর্ধ মিনিট কালও উপেক্ষণীয় নহে। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম,

> সময় যায় নদীর প্রায়,
> কাহারো মুখ চাহেনা হায়।
> চলিছে দিন, চলিছে রাত,
> ধরিতে তায় কাহার হাত?
> ধরিতে তায় সে পারে ভাই,
> আলস্য যার শরীরে নাই।

আমরাও আমাদের শরীরের সকল আলস্য পরিহার করিয়া সময়কে ধরিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ঘড়িগুলির কাঁটার রজ্জুতে ঠিক মিল ছিল না বলিয়া জুৎ করিয়া ধরা যাইতেছিল না। নির্ভুল অবস্থা নির্ণয়ের মধ্যে সংশয়ের অবকাশ থাকিতেছিল।

জামালপুর পৌঁছিয়া স্টেশনের ঘড়ির সহিত আমাদের ঘড়িগুলি যত্নপূর্বক মিলাইয়া লইলাম। তিন-চারিটি স্টেশন পরেই আমাদের সকল সংশয়-উদ্বেগ-আশঙ্কার স্থল কিউল। জামালপুর হইতে ঠিক সময়েই ট্রেন ছাড়িল। তাহার পর প্রতি স্টেশনেই আমরা পূর্ববৎ ঘড়ি ও টাইম্ টেবল মিলাইতে লাগিলাম। কোনো স্টেশন হইতে গাড়ি আধ মিনিট পরে ছাড়ে, কোনো স্টেশন হইতে বা এক মিনিট পূর্বে।

এইরূপে যুগপৎ আশা ও আশঙ্কার হস্তে নিপীড়িত হইতে হইতে মিনিট তিনেক পূর্বেই আমরা কিউল প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিয়া গেলাম। মনে ভাবিলাম, অদৃষ্টপুরুষ এতগুলি প্রাণীর ঐকান্তিক কামনার প্রতি উদাসীন হন নাই,—দয়া করিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টপুরুষ শুধু যে দয়াই করেন না, সময় বিশেষে কৌতুকও করেন, সে কথা তখন কে ভাবিয়াছিল!

গাড়ী থামিলে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া মালপত্র-সহ ত্বরিতপদে আমরা অপর দিকের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলাম। হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে আমাদের রিজার্ভ আসিতেছে কি-না সংবাদ লইবার জন্য শ্রীমান চিররঞ্জন স্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ক্ষণকাল পরে যে সংবাদ লইয়া তিনি ফিরিলেন, তাহা শুনিয়া এক অপূর্ব বিস্ময়-বিরক্তি-কৌতুক ও আনন্দের মিশ্র রসে আমাদের মন ভরিয়া উঠিল! সেই বহু-ঈপ্সার, বহু-কষ্টের, বহু-প্রমাদের টুরিষ্টকার শেষ পর্যন্ত আসিতেছে!—কিন্তু হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারের সহিত নহে। বেলা একটার সময়ে হাওড়া হইতে এক লুপ প্যাসেঞ্জার ছাড়ে, তাহার সহিত। রাত্রি বারোটায় ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়া কিউলে পৌঁছিবে রাত্রি তিনটায়।

ইহাকেই বলে 'খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার!' যথাসময়ে আহারাদি সারিয়া শান্তচিত্তে সুস্থদেহে রাত্রি বারোটার সময়ে ভাগলপুর স্টেশনে টুরিষ্টকারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বেরিলী পর্যন্তর জন্য আমরা নিশ্চিন্ত-সুখের যাত্রী হইতে পারিতাম। তৎপরিবর্তে অসময়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে দ্বিগুণ ব্যয় বহন করিয়া আসিয়া পড়া গিয়াছে যাট মাইল দূরে কিউল জংশনে! চব্বিশ মিনিট অবসরের মধ্যে কি করিয়া সময়-সঙ্কুলান হইবে ভাবিয়া আমরা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলাম; আর, দীর্ঘ নয় ঘণ্টাকাল কিরূপে এখানে কাটাইয়া শেষ করা যাইবে, তাহাই হইল এখন অচিন্তিতপূর্ব দুশ্চিন্তা। ট্রেনে বসিয়া আমরা এক-আধ

মিনিট সময় লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিলাম ; আর এখন মুঠা মুঠা সময় নষ্ট করিলেও ক্ষতি নাই।

যথাসময়ে আমাদের ক্ষণপূর্বের উদ্বেগের বস্তু হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু অদৃষ্ট তখন যাদুযন্ত্রের সাহায্যে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারের দেহে ছিদ্রপথ নির্মাণ করিয়া তাহা হইতে উদ্বেগ-উত্তেজনার সমস্ত বাষ্প নিঃশেষে বাহির করিয়া দিয়াছে! এমনই আমরা নির্বিকার হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, গাড়ির পাশ দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একবার চাহিয়া দেখিতেও খেয়াল হয় নাই, সে গাড়িতে যাইতে হইলে আমাদের স্থান-সঙ্কুলান কি প্রকার হইতে পারিত।

অবহেলায় উপস্থিত হইয়া হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার অনাদরে চলিয়া গেল।

চিত্তরঞ্জনের সহিত কথা কহিতে কহিতে সুদীর্ঘ প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর পদচারণ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি কখন্ অজ্ঞাতসারে প্ল্যাটফর্ম্ জনবিরল হইয়া গিয়াছে। পরিচারকেরা আমাদের জন্য চা-জলখাবার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, কন্যাদুটিকে লইয়া বাসন্তী দেবী একটি বেঞ্চে উপবেশন করিয়া হেমন্ত-সন্ধ্যার কমনীয় শ্রী উপভোগ করিতেছেন ; এবং সতীন্দ্রনাথ (টগর) ও চিররঞ্জন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া সন্ধ্যা-তারা নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথবা অন্য কোনো মৎলবের পিছনে আছেন তাহা দূর হইতে নির্ণয় করা কঠিন।

কথোপকথনের মধ্যে এক সময়ে চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপেনবাবু, শান্তিপুরের কথকঠাকুর পূজার পরে ভাগলপুরে আর আসবেন কি?"

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, ভাগলপুরে আপনার থাকার মধ্যে আর একবার তিনি আসবেন। তা' ছাড়া, যে প্রশ্ন আপনি আমাকে এখন করলেন, কোনো রকমে তা' তাঁর কানে উঠ্‌লে সব কাজ ফেলেও আসবেন ; এমন কি, শান্তিপুরের রাস ফেলেও।"

"কিন্তু এখনকার প্রশ্নের কথা তাঁর কানে উঠবে কি ক'রে? Telepathyর সাহায্যে?" বলিয়া চিত্তরঞ্জন হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম, "তার চেয়ে সহজেও উঠতে পারে,—আমার কাছ থেকে একখানা পোস্টকার্ড পেয়ে।"

শান্তিপুরের উক্ত কথকঠাকুরের কাহিনী এখানে একটু বিবৃত করিলে, আমার বিশ্বাস, কিউল ষ্টেশনের সুদীর্ঘ নব ঘণ্টা কালব্যাপী কি-করা-যায়-এখন সময়ের কিছুটার ব্যবস্থা হইতে পারে।

৭

মাস দেড়েক-দুই আগেকার কথা। একদিন প্রত্যূষে তল্পি-তল্পা লইয়া একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমাট কৃষ্ণবর্ণ দেহ; স্বাস্থ্য দেখিলে মনে হয় পাঞ্জাব দেশে বাস করেন; চক্ষু দুটি প্রতিভাব্যঞ্জক; এবং কারণে ও অত্যল্প কারণে অতর্কিতে এমন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠেন যে, পাশের লোক চমকাইয়া যায়। বয়স বছর পঞ্চাশের কিছু এদিক বা ওদিক।

পরিচয়ে অবগত হইলাম, নাম মোহনলাল গোস্বামী, নিবাস বাঙালা দেশের শান্তিপুর গ্রাম, পেশা কথকতা ও ভাগবত পাঠ। আকৃতির মধ্যে নবদ্বীপ-ভাটপাড়া-শান্তিপুর-সুলভ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতি মোহরের সুস্পষ্ট ছাপ। শুনিলাম পুরাণ শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার, এবং প্রথম শ্রেণীর গায়ক ও বক্তা। পরে দেখিয়াছিলাম, বসিয়া বসিয়াই এমন জোরালো অভিনয় করিতে পারেন, যেমন অনেকে লাফালাফি করিয়াও পারে না।

বয়সের পার্থক্য বেশ-খানিকটা থাকিলেও গোঁসাইজীর সহিত আমার অন্তরঙ্গতা জমিতে বিলম্ব হইল না। বয়সের উপর আমরা সাধারণত যতটা গুরুত্ব আরোপ করি, বস্তুত বয়স ততটা গুরু ব্যাপার নহে। বয়সের সমতা মিলনের একটা ক্ষেত্র বটে; কিন্তু সে মিলনের ক্ষেত্রের ঘাসে সব সময়ে শিশির জমেনা, এবং গাছে সব সময়ে ফুল ফুটে না। মিলনের উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র, বোধ করি, রুচি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্র। তেমন ক্ষেত্রে মিল যদি হয়, তাহা হইলে বায়ু শিশির ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, এবং বৃক্ষ কোরক ছাড়িতে থাকে।

ভাগলপুরে আগমনের কথা একটু প্রচার হওয়ার পর দুই তিন দিন অন্তর মোহন গোঁসাই কথকতার গাওনা পাইতে লাগিলেন। পারিশ্রমিক

সাধারণত দশ টাকা। অল্প হইলেও অংশভাগী নাই বলিয়া একরকম পোষাইয়া যায়।

কয়েক স্থানে কথকতা হইবার পর একদিন গোঁসাইজী আমাকে বলিলেন, "উপেনবাবু, আপনার ত' দাশ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্টতা আছে, আপনি যদি ওঁর বাড়িতে একদিন আমার কথকতার ব্যবস্থা করেন ত' উপকৃত হই। ওঁর মতো অসাধারণ লোকের সামনে কথকতা করার সুযোগ লাভই মহা সৌভাগ্যের কথা।"

বলিলাম, "এ এমন-কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস, আনন্দের সঙ্গে তিনি সম্মত হবেন।"

অনুমানে ভুল হয় নাই। প্রস্তাব মাত্র উৎসাহের সহিত চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "খুব ভাল কথা। যেদিন হয় এর ব্যবস্থা করুন।"

গৃহে যখন ফিরিলাম তখন রাত্রি কতকটা আগাইয়া গিয়াছে। অন্দরে প্রবেশ করিবার কালে গোঁসাইজীর ঘর হইতে গভীর নাসিকা-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, নৈশ আহার শেষ করিয়া গোঁসাই নিদ্রার সুমিষ্ট প্রথম পর্বে প্রবেশ করিয়াছেন। সুসংবাদের দ্বারাও সে নিদ্রা খণ্ডিত করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরদিন সকালে বহির্বাটীতে আসিয়া দেখি মোহনলাল স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। বলিলাম, "সুসংবাদ আছে গোঁসাইজী। কি পুরস্কার দেবেন বলুন?"

বুদ্ধিমান লোক; বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আনন্দোদ্ভাসিত মুখে গোঁসাইজী বলিলেন, "রাজি হয়েছেন?"

বলিলাম, "শুধু রাজিই হননি,—আনন্দের সঙ্গে হয়েছেন। তা ছাড়া, আপনার পারিশ্রমিক স্থির করেছেন পঁচিশ টাকা।"

শুনিয়া গোঁসাইজী অভিভূত হইলেন। দাশ সাহেবের সম্মুখে কথকতা করিবার সুযোগ লাভই ত', তাঁহার মতে, এক মহা সৌভাগ্যের

কথা ; তাহার উপর পারিশ্রমিক আড়াই গুণ বেশি। এ যেন রাজকন্যা লাভের সহিত অর্ধেক রাজ্য যৌতুক পাওয়া।

হয় ত' এই ব্যবস্থাটুকুর দ্বারা গোঁসাইজীর যৎসামান্য উপকারে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তজ্জন্য তিনি আমাকে নির্মমভাবে কৃতজ্ঞতার বন্যায় ভাসাইতে থাকিবেন জানিলে কথাটা সামনাসামনি না বলিয়া একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়া জানাইতাম।

বলিলাম, "মশায়, সামান্য লোকের কথা এখন বাদ দিন। আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ আছে।"

উৎসুকচিত্তে গোঁসাইজী বলিলেন, "কি পরামর্শ, বলুন ?"

বলিলাম, "যে-কয়েকবার আপনার কথকতা শুনেছি, তা'তে নিঃসন্দেহে মনে করতে পারি, দাশ সাহেবকে আপনি খুসি করতে পারবেন। কিন্তু খুসি যদি একটু বিশেষ ভাবে করতে চান, তা হ'লে তার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করাও দরকার।"

আগ্রহ-সহকারে গোঁসাইজী বলিলেন, "কি বিশেষ ব্যবস্থা, বলুন ?"

বলিলাম, "যে পালা আপনি দাশ সাহেবের বাড়ি গাইবেন, তার মধ্যে যদি দাশ সাহেবের রচিত একটা গান ঢুকিয়ে দিয়ে সুর সংযোগে গাইতে পারেন, তা হ'লে আমাদের মৎলবের উপযুক্ত একটা বিশেষ ব্যবস্থা হয়।"

আগ্রহ সহকারে মোহনলাল বলিলেন, "কিন্তু গান ? গান কোথায় পাব ? আছে আপনার কাছে ?"

বলিলাম, "আছে।"

তখন আমার কাছে চিত্তরঞ্জন কর্তৃক রচিত অনেকগুলি গানের একটি পাণ্ডুলিপি খাতা ছিল। তাহা হইতে কয়েকটি গানে আমি সুর সংযোগ করিয়া চিত্তরঞ্জনের বাসভবনে সঙ্গীত মজলিশে সকলকে শুনাইয়াছিলাম। সে কথা গোঁসাইজীকে জানাইয়া বলিলাম, "একটি গান আছে, তার প্রথম লাইন, 'আজিকে বঁধু, থেকোনা দূরে'। গানটিতে

লাগিয়েছি একতালা ছন্দে পাহাড়ী রাগের সুর। আমার দেওয়া সুরের মধ্যে ঐ গানটিই দাশ সাহেব সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন।"

অধীর আগ্রহে গোঁসাইজী বলিলেন, "গানখানা মনে আছে।"

বলিলাম, "তা হয় ত' আছে।"

"গান, একটু শুনি।"

বলিলাম, "আগে স্নান-আহ্নিক সেরে জল-টল খান, তারপর শুনলেই হবে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া গোঁসাইজী বলিলেন, "না, তা হয় না। উদ্বেগ মনের মধ্যে লেগে থাক্‌লে আহ্নিক ভাল ক'রে হবে না। গান্ আপনি—গুন্ গুন্ ক'রে।"

বুঝিলাম গোঁসাই উতলা হইয়াছেন, নিরস্ত করা কঠিন হইবে। বলিলাম, "তা হ'লে একটু আড়ালে চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে গুন গুন ক'রে গাইলেও মক্কেলরা এসে শুনে ফেললে ফি কম দেবে। মক্কেলরা বক্তৃতা পছন্দ করে, গান পছন্দ করে না।"

"ভারি বেরসিক ত মক্কেলরা!" বলিয়া গোঁসাইজী বলিলেন, "তা হ'লে আড়ালেই চলুন।"

তৈলের বাটিতে তৈল অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া রহিল গানের এন্তেজারিতে। বারান্দার পশ্চিমদিকে একটা লাল বকফুলের গাছ ছিল, তাহার তলায় উপস্থিত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে গান ধরিলাম—

আজিকে বঁধু, থেকোনা দূরে,
গেয়োনা অমন করুণ সুরে!
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠেছে পরাণপুরে!
আজিকে তোমার সোহাগ তরে
সকল দেহ উথলে পড়ে,

আজিকে তব পরশ লাগি,
ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে।
আজিকে ঘোর বিরহ বাহি'
উঠেছে ঝড় পরাণপুরে।

গান শুনিতে শুনিতে গোঁসাইজীর মুখ উল্লসিত হইয়া উঠিতেছিল। গান শেষ হইলে বলিলেন, "চমৎকার গান! পালার মধ্যে এ গান ঢোকাব কি, এই গানটির দ্বারাই পালা আমার ঠিক হয়ে গেছে।"

স্নান-আহ্নিক সারিয়া জলযোগের পর গোঁসাইজী গানখানি লিখিয়া লইলেন। তাহার পর বার কয়েক আমার নিকট হইতে সুর একটু বুঝিয়া লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টা কয়েক পরে কাছারি যাইবার সময়ে শুনিলাম, গোঁসাইজীর ঘরে মৃদুস্বরে পাহাড়ী রাগের লহর চলিয়াছে।

অপরাহ্নে কাছারি হইতে ফিরিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সহসা পিছন দিকে চাপকানে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি গোঁসাইজী। হাসিয়া বলিলাম, "কি ব্যাপার?"

"একবার শুনে যান গানটা।"

বেশ পরিবর্তন করিয়া অবিলম্বে আসিতেছি বলিয়া আশ্বাস দিলাম। গোঁসাইজীর কিন্তু সবুর সহিতেছিল না। বলিলেন, "সে পরে চা-টা পান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আসবেন অখন, আপাতত চাপকান প'রে ধুলো পায়ে একবার হ'য়ে যাক।"

"তবে হ'য়েই যাক।" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া গোঁসাইজীর সহিত তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলাম।

গানটি আগাগোড়া দুই ফের গাহিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা ভরে গোঁসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে?"

গান শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম; কহিলাম, "চমৎকার হয়েছে! জয় আপনার অনিবার্য।"

ওস্তাদ গায়ক,—সমস্ত দিন ধরিয়া সাধিয়া সাধিয়া সুরলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সকাল বেলা দিয়া গিয়াছিলাম যে সুর-শিশুকে,—অপরাহ্ণ কালে দেখিলাম তাহার কিশোরী মূর্তি; কথকতার দিন সে যে যৌবন-শ্রীতে উজ্জ্বল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

দিন তিনেক পরে চিত্তরঞ্জনের গৃহে কথকতার ব্যবস্থা হইল। লছমীপুর মকদ্দমার বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষের উকিল, ব্যারিষ্টার এবং কর্ম্মচারীগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। তদ্ভিন্ন, মকদ্দমার অসংক্রান্ত যে-সকল ব্যক্তির সহিত ভাগলপুরে বাস কালে চিত্তরঞ্জনের পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদেরও প্রায় সকলেরই নিকট নিমন্ত্রণ পৌঁছিল। চিত্তরঞ্জনের গৃহে মোহনলাল গোস্বামীর কথকতা,—শহরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

যথাদিবসে সন্ধ্যার পর গোঁসাইজীকে লইয়া চিত্তরঞ্জনের বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। দীপনারায়ণ সিংহের সুরম্য বৈঠকখানা বাড়ির বিস্তৃত হল-ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র সরাইয়া মেঝের উপর প্রশস্ত ফরাস পড়িয়াছে। শতাবধি লোক অনায়াসে বসিতে পারে। কক্ষের শীর্ষদেশে কথকঠাকুরের অনুচ্চ বেদী। বাকি স্থানে শ্রোতারা একে একে আসিয়া বসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হল-ঘর উৎসুক জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল।

চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া গোঁসাইজী কথকতা আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকালব্যাপী সংক্ষিপ্ত গৌরচন্দ্রিকার পর পালা আরম্ভ হইল।

মথুরাধিপতি কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহার ভাবী হন্তা কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে কংস ধনুর্যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ফন্দী খাটাইয়াছেন। কৃষ্ণ মথুরায় উপস্থিত হইলে পরাক্রান্ত মল্ল ও মত্ত মাতঙ্গের দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন, ইহাই অভিসন্ধি। অক্রূরের মুখে প্রকৃত কথা অবগত হইয়া, এবং কংসের হস্তে যাদবগণের উৎপীড়নের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া কৃষ্ণ

কংসকে বধ করিয়া যাদবগণকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে মথুরায় গমন করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবন বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত হইল। গোপীজনবল্লভের অদর্শনে গোপ-গোপীগণের দুঃখের ত' অবধি নাই,—পাখী পর্যন্ত গান গাহেনা, ময়ূরী নৃত্য করেনা, বৎসসহ ধেনু আহার ছাড়িয়া বংশীধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আজ তিন দিন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—তিন দিনেই বৃন্দাবন অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, উদাস উতলা বায়ু ঘনপত্র তমাল বনের অন্তর ভেদ করিয়া হাহারবে বিলাপ করিয়া ফিরিতেছে, তাহার ফলে তমাল পত্র বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে, সে যেন বৃষ্টির জল নহে,—যেন বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কৃষ্ণবিরহ শোকে অধীর হইয়া তমাল পত্রের মধ্য দিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। এমন সময়ে বিরহিণী রাধার হৃদয় মথিত করিয়া করুণ-মধুর গীতি আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ হইল,

আজিকে বঁধু, থেকোনা দূরে,
গেয়োনা অমন করুণ সুরে।
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠেছে পরাণপুরে।

করুণ পাহাড়ী রাগের সুরে ঢালা সুমিষ্ট গীতির প্রভাবে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ও নিঃসন্দেহ হইয়াছিল,—কিন্তু গানখানি যে তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ঈষৎ অবনত মস্তকে, বোধহয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তিনি কথকতা শুনিতেছিলেন; তদবস্থায় থাকিয়াই গানও শুনিতে লাগিলেন। নিজের বলিয়া গানখানিকে চিনিতে পারিলে দৈহিক অবস্থার একটা কিছু পরিবর্তন, তা সে যত সামান্যই হউক না

কেন, নিশ্চয়ই দেখা যাইত। সম্পূর্ণ নূতন এবং অপ্রত্যাশিত এক পরিবেশ গানখানিকে অদ্ভুতভাবে নিজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া আত্মসাৎ করায় চিত্তরঞ্জনের পক্ষে নিজের রচনাকে অমন করিয়া ভুলিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই;—এমনই হইয়া থাকে। দীর্ঘ কারাযাপনের পর সুদূর প্রবাসে মুক্তিলাভ করিয়া আমার অনূঢ়া কন্যাটিকে সহসা যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো এক গৃহের বধূরূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলে প্রথমটা হয়ত' চিনিতেই পারি না। তাহার পর অকস্মাৎ কোনো-এক মুহূর্তে তাহার মুখের এক ঝলক হাসি দেখিয়া, অথবা একটা কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠি, তাইত। এযে আমারই কন্যা মালতী!

চিত্তরঞ্জনেরও ঠিক সেইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। গোঁসাইজী যখন তাঁহার গানের অস্থায়ী অংশ গাহিতেছিলেন, তখন 'কার গান, না কার গান' ভাবিয়া তিনি শুধু গানের কথা ও সুরের রস গ্রহণ করিবার কার্যেই মশগুল ছিলেন। কিন্তু অন্তরায় প্রবেশ করিয়া গোঁসাইজী যখন গাহিলেন,

> আজিকে তোমার সোহাগ তরে
> সকল দেহ উথলে পড়ে,
> আজিকে তব পরশ লাগি
> ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে!

তখন হঠাৎ চটকা ভাঙ্গিল। অবনত মস্তক খাড়া করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে খুঁজিতে লাগিলেন সেই পাষণ্ডকে, যে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন এক কৌতুক-রসাশ্রিত আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে! বৃহৎ চশমার বড় বড় দুইটা লেন্স্ উজ্জ্বল সার্চ লাইটের মতো ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অল্প দূরে আমি চিত্তরঞ্জনের সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। কৌতুকটা যাহাতে শীঘ্র

শেষ না হইয়া ক্ষণকাল ধরিয়া চলে সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের পিছনে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নিচু করিয়া করিয়া আত্মগোপন করিতে লাগিলাম। ধরা পড়িতে কিন্তু বিশেষ বিলম্ব হইল না। চোখোচোখী হইতেই চিত্তরঞ্জনের মুখমণ্ডলে যে প্রাণখোলা নিঃশব্দ মধুর হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজও আমার মনে সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। চিত্রকর হইলে হুবহু আঁকিয়া দিতে পারিতাম।

কথকতা শেষ হইলে মোহনলাল পঁচিশ টাকা পাইলেন কথকতা করিবার পারিশ্রমিক বাবৎ, এবং 'আজিকে বঁধু' গানখানি কথকতার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিবার জন্য পাইলেন আর এক দফা পঁচিশ টাকা। অর্থাৎ, মোটের উপর পঞ্চাশ টাকা।

৯

নৈশ আহার সমাপনের পর স্টেশনের দুইখানি ওয়েটিংরুম অধিকার করিয়া আমরা যথাসম্ভব একটু ঘুমাইয়া লইবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইলাম। অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য শয্যা খুলিয়া উচ্চতর আরাম করিবার দুশ্চেষ্টা কাহারও হইল না। ইজিচেয়ার, বেঞ্চ, সোফা, টেবিল—যেখানে যে স্থান পাইল, কেহ লম্বালম্বি ভাবে, কেহ কুণ্ডলী পাকাইয়া, কেহ আলুলায়িত ঠামে, শুইয়া পড়িল। আমার ভাগ্যে একখানা একটু বিচিত্র গঠনের ইজিচেয়ার জুটিয়াছিল। তাহার গঠনের ছাঁচে দেহকে স্থাপিত করিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেদনায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যথিত দেহকে চেয়ারের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া শরীরের ঋজুভঙ্গীকে ফিরিয়া পাইতে কিছু সময় লাগিল।

ঘরের ভিতর একদিকে নাসিকাধ্বনির আগম-নির্গমের শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রীমান চিররঞ্জন ও শ্রীমান সতীন্দ্রনাথ কখন দীর্ঘ বেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া একটা বড় গোল টেবিলের উপর চাদর বিছাইয়া নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সতীন্দ্রনাথের নাসিকাধ্বনির মধ্যে উত্থান-পতনের যে অনায়াস ছন্দ, তাহা একমাত্র ব্যক্ত করে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য। মনের মধ্যে একটু যেন ঈর্ষার উদ্রেক হইল। নিজের পরিত্যক্ত আসনের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম। উহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে হয়ত' আর এক দফা ঘুম হইতে পারে; কিন্তু নাক ডাকাইয়া? অসম্ভব! ঘড়ি দেখিলাম রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তবে আর কেন? বাহিরে প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উর্ধে চাহিয়া দেখি, তারকার চুমকি বসানো নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়া নিশীথিনী আকাশ জমকাইয়া বসিয়া নিম্নে ধরণীর প্রতি মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছে। সহানুভূতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় ধরণীর অঙ্গ শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে।

রিত্রিক্ত স্টেশনের নির্জন প্লাটফর্মের উপর একাকী পদচারণা করিতে লাগিলাম। কুলিরা ঘুমাইয়াছে, মুসাফিররা ঘুমাইয়াছে, এমন কি বুকিং অফিসে বাবুরা পর্যন্ত নিদ্রার কবলে আত্মসমর্পণ করিযাছে। শুধু টেলিগ্রাম রুমে মাঝে মাঝে হাঁক ডাক শুনা যাইতেছে।

পদশব্দে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, চিররঞ্জন ও সতীন্দ্র ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বলিলাম, "ঘুম ভাঙল?"

সতীন্দ্র বলিলেন, "অত অসুবিধেতে কি ঘুম হয়।"

বলিলাম, "কিন্তু তোমার নাক ডাকছিল টগর।"

মৃদু হাসিয়া সতীন্দ্র উত্তর দিলেন, "নাক ত' আমার ঘুমের অসুবিধে হ'লেই ডাকে।"

এ কথার উত্তর নাই,—চুপ করিয়া গেলাম।

কতকগুলো ট্রেন আসা-যাওযার সময় আগাইযা আসিতেছে।

সর্বপ্রথম ঘুম ভাঙ্গিল চায়ের দোকানদারদের। ঝিমানো উনানে নূতন করিয়া কয়লা দিয়া তাহারা আঁচ বাড়াইতে লাগিল। অভ্যাসের বাহাদুরি দেখিয়া অবাক হইলাম। যাহার যেমন গরজের তাড়া, তাহার তেমনি আগে-ভাগে ঘুম ভাঙিতেছে। দেখিতে দেখিতে স্টেশনের সকল শ্রেণীর লোকই জাগিয়া উঠিল; কিন্তু কুলিদের অধিকাংশ তখনো নিদ্রামগ্ন। অবশেষে রাত্রি তিনটার কাছাকাছি লুপ প্যাসেঞ্জার যখন প্রায় ডিসট্যান্ট্ সিগনালের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কে তাহাদের ঘুম ভাঙাইল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে।

দেখিতে দেখিতে উত্তর দিকের প্ল্যাটফর্মে লুপ প্যাসেঞ্জার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অবয়বের এক স্থানে একটি সুগঠিত সুদীর্ঘ শুভ্র কায় দেখিয়া আমাদের মনও আনন্দের শুভ্র রাগে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল পরে উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করিতে করিতে উন্মত্ত গতিভরে পাঞ্জাব মেল আমাদের পার্শ্বে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

ইত্যবসরে একটি এঞ্জিন লুপ প্যাসেঞ্জার হইতে টুরিষ্ট কারটি কাটিয়া লইয়া পাশের লাইনে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—পাঞ্জাব মেল আসিতেই তাহার পিছনে টুরিষ্টকার লাগাইয়া দিয়া সরিয়া গেল। উজ্জ্বল তড়িতালোকিত সেই সুরম্য গৃহে প্রবেশ করিয়া নিমেষের মধ্যে আমাদের সকল কষ্ট এবং বিরক্তি অপসৃত হইল।

টুরিষ্টকারের খাতির অসামান্য। স্বয়ং স্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিনিসপত্র ও লোকজন উঠাইবার ব্যবস্থা দেখিতেছিলেন। সব ঠিক হইলে, আমাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তিনি গার্ডকে ইঙ্গিত করিলেন। গার্ড হুইসিল দিয়া গাড়ি ছাড়িবার আদেশ দিল। স্প্রিং-এর একান্ত ঔৎকর্ষ্যবশতঃ প্রথমটা আমরা বুঝিতেই পারি নাই যে, গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্ল্যাটফর্মের আলোকগুলি নিঃশব্দে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম, কিউল ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়াছি।

প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া নীরন্ধ্র তিমির রাশির মধ্যে ট্রেণ প্রবেশ করিল। ঝন্ ঝন্ রবে লক্ষ্মীসরাইয়ের পুল পার হইয়া যাওয়ার পর আমরা বাতি নিভাইয়া দিয়া দুইটি শয়ন কক্ষে নিজ নিজ শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। বাহিরে অন্ধকার, ভিতরে অন্ধকার,—অন্ধকার সাগরের মধ্য দিয়া মৃদু-মন্দ দোল খাইতে খাইতে ও ইলেকট্রিক্ ফ্যানের অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল না।

প্রত্যূষে জন-কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাঁকিপুর স্টেশনে দাঁড়াইয়া সোঁ সোঁ রবে গাড়ি স্টিম ছাড়িতেছে। তরুণ হেমন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতের অনুগ্র আলোকে আমাদের কক্ষটি ভরিয়া গিয়াছিল। গত রাত্রের অনিদ্রা বশতঃ দুই চক্ষে তখনো ঘুম জড়াইয়া আছে,—কিন্তু সেই আলোক ও কোলাহলের অপরূপ জড়াজড়ির মধ্যে এমন অননুভূতপূর্ব্ব একটা উদ্দীপনার সাড়া পাইলাম যে, প্রয়োজন সত্ত্বেও পুনর্বার শয্যা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। দেখিলাম, শুধু আমারই নহে, আমাদের কক্ষের সকলেরই চক্ষে প্রভাত-সূর্যের রশ্মি একই প্রকার ক্রিয়া করিয়াছে। আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া একে একে সকলেই উঠিয়া বসিলেন।

এই বাঁকিপুর স্টেশন দিয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছি; এই বাঁকিপুর শহরে কত দিন, কত মাস বাস করিয়া কাটাইয়াছি; কিন্তু আজিকার কোলাহল, উদ্দীপনার, উত্তেজনার মধ্যে যেমন একটি বিশেষ সজীবতা অনুভব করিলাম, এমন আর কোনোদিন করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। এ যেন দীর্ঘ রজনীর নিদ্রাভঙ্গের পর জাগ্রৎ জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার চঞ্চলতা। এ যেন সহজলব্ধ সৌভাগ্যকে নগ্নভাবে উপলব্ধি করিবার উদগ্র আগ্রহ।

হইতে পারে এরূপ অনুভূতির হেতু বাঁকিপুর স্টেশনের বিশেষ কোনো বস্তুর মধ্যে তত না থাকিয়া প্রধানত আমার মনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু পুরাতন পাটনা শহরের জীর্ণ খোলা ভাঙিয়া এক নূতন পাটনা-শাবক নির্গত হইয়া তরুণ প্রাণশক্তির উদ্দীপনায় খানিকটা যে পাখা ঝাপটাইতেছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। প্লেগ-কলেরার লীলাক্ষেত্র এই অপ্রশস্ত একহারা অপরিচ্ছন্ন শহরটিতে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের রাজলক্ষ্মী একদিন তাঁহার বাসা বাঁধিবেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে এ কথা স্বপ্নেও বোধহয় কেহ কল্পনা করিতে সাহস করিত না।

শুনিয়াছিলাম, সর্বপ্রকার চাহিদা মিটাইয়া প্রাদেশিক রাজধানীর উপযুক্ত করিবার জন্য শহরের পশ্চিম দিকে শত শত ইমারৎ ও অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে। গাড়ি ছাড়িলে আমরা আগ্রহসহকারে অগণিত ভারার বংশ-পঞ্জরে আবদ্ধ এই ভবিষ্যৎ রাজনগরীর ইঁট-চূণ-সুরকির কঙ্কাল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। হাইকোর্ট, লাট-প্রাসাদ, সেক্রেটারিয়েট, ব্যাঙ্ক, জেনারেল পোষ্ট অফিস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহিত সরকারি ও বেসরকারি আগন্তুকদের বাসের উপযুক্ত বহুসংখ্যক সৌধ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নির্মিত করিয়া লইবার জন্য একটা বিপুল চেষ্টা দেখা দিয়াছে। চূণ, সুরকি ও ইঁটের স্তূপে রেল লাইনের দুই দিক ভরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সুবৃহৎ চালা-ঘরের মধ্যে কাঠ চেরাইয়ের ব্যবস্থা। সুদৃঢ় ফ্রেমের উপর বাঁকা ভাবে হেলান দিয়া রহিয়াছে বড় বড় শাল ও সেগুনের গুঁড়ি বিদীর্ণ হইবার অপেক্ষায়। হয়ত', বেলা আটটা হইতে উদ্যমশীল গুজরাটি ঠিকাদারেরা দরজা-জানালা-চৌকাঠ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য সুদক্ষ করাতীগণের দ্বারা চেরাই-কার্য্য আরম্ভ করিবে।

দেখিলাম বাঁকিপুর বিস্তৃত হইয়া প্রায় দানাপুরের অর্দ্ধেক পথে আসিয়া ঠেকিয়াছে। উত্তর দিকে জাহ্নবী নদী এবং দক্ষিণে রেল লাইন কর্তৃক আবদ্ধ হওয়ায় এই শহরটির পক্ষে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পূর্বদিকে অতি প্রাচীন পাটনা শহর জমাট স্থবিরতায় এমন এক ঊষর ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন প্রসারণের পক্ষে যাহা আদৌ অনুকূল নহে। সুতরাং, কলেবর বৃদ্ধির অতি-তাড়নায় ফলে শহরটি একমাত্র পশ্চিমদিকেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যতে এই দীর্ঘ কিন্তু শীর্ণ নগরের মধ্যস্থলে ভেদ করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ট্র্যাম লাইন পাতিলেই শহরের সকল স্থান সুগম হইবে। এমন কি, পর্যটকের পক্ষে ট্রেন হইতে না নামিয়া ট্রেনের গবাক্ষ হইতেই নগর পরিদর্শন করা একরূপ চলিতে পারিবে।

ভাগ্য পরিবর্তনের সহিত শহরের নাম পরিবর্তনেরও একটা কথা উঠিয়াছে। সংস্কৃত পট্টন শব্দ হইতে পাটনা শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, অর্থগৌরব-বর্জিত আভিজাত্য-গন্ধ-বিহীন এই অপশব্দের মধ্যে অকৌলীন্যের বাষ্প নিহিত থাকায়, অনেকের মতে ইহা প্রাদেশিক রাজধানীর নাম হইবার পক্ষে অনুপযুক্ত। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পূর্বে স্কুলে যাহার নাম ছিল পটলমণি, কলেজ জীবনে তাহার নাম অন্ততঃ নিভাননী হাওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহারা প্রাচীনপন্থী তাহারা ইহার পুরা-কালিক নাম পটলিপুত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ অজাতশত্রু পাটলিপুত্র নামে বর্ত্তমান পাটনা শহরের প্রতিষ্টা করেন। যাহাদের সৌখীন এবং মোলায়েম নাম ভাল লাগে, তাহারা পাটনা নাম বাতিল করিয়া কুসুমপুর রাখিতে আগ্রহশীল। পাটলিপুত্রের অপর-এক নাম ছিল কুসুমপুর। কিন্তু এসকল বিতর্কের কোনো কারণই ঘটিত না যদি স্যার আলি ইমাম স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে বিহারকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার সময়ে পাটনার নামটাও ইমামাবাদ করাইয়া লইতেন। তাহা হইলে, যুক্ত-প্রদেশের রাজধানী আললাহাবাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতারূপে ইমামাবাদ সুচিরকাল স্যার ইমামের কীর্তি বহন করিয়া চলিত।

ইঁট-কাঠ-চূণ-সুরকির রাজ্য পার হইয়া ট্রেন ছুটিয়াছে বিহারের উর্বর সমতল শাক-সবজির ক্ষেত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া। দুইদিকে কপি-আলু-কড়াইসুঁটির হরিৎ-লীলার সমারোহ। তাহার উপর প্রভাত সূর্য্যের সোনালি আভা পড়িয়া স্তিমিত আলোকের অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। নীলাভ আকাশের পটভূমির উপর দিয়া মাঝে মাঝে উড়িয়া যাইতেছে দুগ্ধশুভ্র বকের শ্রেণী জলাভূমির উদ্দেশে। ক্বচিৎ কোথাও টেলিগ্রাফের তারে উপবিষ্ট ফিঙা অথবা নীলকণ্ঠ পাখী চক্ষের নিমেষে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে পিছন দিকে হটিয়া যাইতেছে। গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি যাইয়া দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত সম্মুখবর্তী

সমগ্র ভূখণ্ড যেন একটা দুর্বার আবর্তে পড়িয়া চক্রাকারে পাক খাইতেছে।

"উপেন বাবু!"

চাহিয়া দেখি বাসন্তী দেবী পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। বলিলেন, "বাহিরের দৃশ্য ত' সমস্ত দিনের জন্যই রইল,—হাত-মুখ ধুয়ে চা-খাবার খেয়ে নিন।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এরই মধ্যে চা-খাবার প্রস্তুত ?"

মৃদু হাসিয়া বাসন্তী দেবী বলিলেন, "একবার যদি উঁকি মেরে দেখে আসেন, তা হ'লে দেখবেন, আপনাদের এই রেলগাড়ির রান্নাঘর ভাগলপুরের রান্নাঘরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যে-ভাবে কাজ চলেছে তা'তে আশা হয়, বেলা দশটাব মধ্যে আপনারা মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসতে পারবেন।"

"বলেন কি! ছুটির দিনে বাড়িতে একটার আগে খাইনে,—আর গাড়িতে বেলা দশটার মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন!"

দেখিতে হইল।

আসন ত্যাগ করিয়া চারিদিকে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই সুবৃহৎ গতিশীল গৃহের চতুঃসীমা জুড়িয়া সংসার তাহার আসন বিছাইয়া বসিয়াছে। কিচেন রুমে দুইজন সুদক্ষ পাচক উন্নত-প্রণালীর চুল্লি, কুকার ও হিটারের সহায়তায় ষোড়শোপচারে রন্ধন কার্যে ব্যস্ত। দুইটি বৃহৎ আয়তনের প্যাকিং বক্স খুলিয়া রন্ধন, পরিবেষণ ও ভোজনের উপযুক্ত যাবতীয় দ্রব্য নির্গত হইয়াছে। রন্ধনের বাসন-পত্র পাকশালায় ব্যবহৃত হইতেছে; সাত-আট জনের উপযুক্ত চিনামাটির ভোজন-পাত্র এবং চা-পান করিবার সর্ববিধ সরঞ্জাম একটি কাঠের টেবিলের উপর পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত হইয়া ব্যবহারের অপেক্ষায় অবস্থান

করিতেছে। দেওয়ালে সংলগ্ন দুইটি র‍্যাক জুড়িয়া কেক-বিস্কুট, মাখম-রুটি, কোকো-কণ্ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যোপকরণের সুপ্রচুর সমাবেশ।

গৃহসুলভ সুখ-সুবিধাকে যথাসম্ভব আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে গাড়ির ভিতর যত কিছু উপায় এবং কৌশলের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে বোধহয় একটিকেও কাজে লাগানো হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই। দরজার একপাশে একটা যে দুর্নিরীক্ষ্য কাঠের পিন আছে, তাহাতেও ভৃত্যেরা একটা ঝাড়ন ঝুলাইয়া ছাড়িয়াছে।

বাথরুমে প্রবেশ করিয়া তথাকার সাজ-সজ্জার প্রাচুর্য এবং পারিপাট্য দেখিয়া মন শুধু প্রসন্নই হইল না,—ঈষৎ পীড়িতও বোধ করিল। স্যাকারিনের বড়ি মুখে ফেলিয়া চুষিলে উগ্র মিষ্ট স্বাদের সহিত যেমন একটু কষা স্বাদও পাওয়া যায়, কতকটা সেইরূপ। টুথপেষ্ট, সাবান, তৈল, পমেড, চিরুণি, ব্রাশ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া তোয়ালে, গামছা, হেয়ারওয়াশ, স্নো, ক্রীম, পাউডার প্রভৃতির সমারোহ দেখিয়া মনে হয় না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে বেরিলি স্টেশনে এই গাড়ী ছাড়িয়া আমাদের নামিয়া যাইতে হইবে। জীবন সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সরল হওয়াও কম বাঞ্ছনীয় নহে। সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ সুখী যতটা হয়, স্বস্তি সব সময়ে ঠিক ততটাই পায় না। তাই, সংসারের একশ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল' মতবাদের অনুসরণ করে। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দের সন্ধান লাভ করেন না,—করেন রিক্ততার মধ্যে। 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' তাঁহাদের অভিমত। মাত্র দশ-বারো ঘণ্টার জন্য উদ্যমশীলতার এতখানি ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পরক্ষণেই কিন্তু খেয়াল হইল, ক্ষণিকের ক্ষণিকত্বকে উপেক্ষা করিয়া দড়ি-দড়া দিয়া পাকাপাকি ভাবে তাহাকে বাঁধিবার উদ্যমশীলতা আমাদের প্রকৃতির রক্ত-মাংসের মধ্যে বর্তমান। জীবনটাই বা আমাদের

একটা বৃহত্তর রেলগাড়ি ছাড়া আর কি ? সময়ের পিচ্ছিল লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ইহার চাকাগুলি দিবসে চব্বিশ ঘণ্টার গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। জীবন-রেলগাড়িরও অগ্রভাগে বাঁশি বাজে, এবং পশ্চাৎ দিকে ঝাণ্ডা নড়ে। সম্মুখবর্তী সবুজ এবং লাল আলোকগুলির নির্দেশ অনুসারে গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে করিতে অবশেষে সেও একদিন অন্তিম (terminus) স্টেশনে উপনীত হইয়া নিঃশেষপ্রায় বাষ্পের শেষ নিশ্বাস-টুকু ছাড়িয়া মহাবিরতি লাভ করে। এই জীবন-রেলগাড়িরই বা চরম দৌড় কতটুকু ? বড় জোর, নব্বই কি পঁচানব্বই বৎসর। ইহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য বাড়ি-ঘর-দোর, জমি-জমা-জমিদারী, মামলা-মকর্দমা-সন্ধি-বিগ্রহের যে বিপুল আয়োজন, তাহার তুলনায় সময়ের এই পঁচানব্বই বৎসরের দৈর্ঘ্য নগন্য। সুতরাং—

সহসা দৃষ্টি পড়িল চিনামাটি নির্মিত পূর্ণায়তন ঝকঝকে বাথটবের উপর। অভিরুচি অনুযায়ী শীতল ও উষ্ণ জল মিশাইয়া ভরিয়া লইয়া দেহকে ইহার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া ক্ষণকাল শুইয়া থাকিতে পারিলে ধূলি-কয়লা-বালুকা হইতে আরম্ভ করিয়া অনিদ্রা-উত্তেজনা পর্যন্ত সকল প্রকার রেল-পীড়ার একেবারে সলিল-সমাধি। রেলগাড়িতে পেট ভরিয়া আহার করিবার বহুবিধ উপায় আছে ; কিন্তু দেহ ভিজাইয়া স্নান করিবার এরূপ সুযোগ দুর্লভ। লুব্ধ হইলাম। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সকলের অলক্ষিতে সুটকেস হইতে একখানা ধুতি বাহির করিয়া আনিয়া যথাকল্পিত অবগাহন-শয্যা রচিত করিয়া শয়ন করিলাম।

ক্ষণকাল পরে চুল আঁচড়াইয়া পরিবর্তিত বস্ত্রে স্নাতস্নিগ্ধ দেহে যখন চায়ের মজলিসে উপস্থিত হইলাম তখন আরা স্টেশন ছাড়িবার অভিপ্রায়ে ট্রেন সিটি দিয়াছে।

ওরূপ পরিমার্জিত তাজা অবস্থায় আমাকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"কি ব্যাপার ? এরই মধ্যে স্নান ক'রে নিলেন না-কি ?"

"অবশ্য।" সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিলাম। খুব একটা বাহাদুরি করিয়া ফেলিয়াছি, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া মেজাজ তখন কতকটা চড়া পর্দায় টানা ছিল !

"পুরো ? না, ফ্রেঞ্চ ?"

"অবগাহন।"

শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মুখে সবিস্ময় প্রশংসার আভা ফুটিয়া উঠিল। আমার আশাতীত তৎপরতা এবং সৎসাহস দেখিয়া বাসন্তী দেবী খুসি হইলেন, এবং দলের মধ্যে দুই-একজন এই সদ্যস্থাপিত সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন অর্ধনিঃশেষিত চায়ের প্রথম পেয়ালাটি হাতে লইয়া জানালার ভিতর দিয়া সুদূর আকাশের দিকে চাহিয়া গভীরভাবে চিন্তাবিষ্ট ছিলেন,—কাব্যলোকের কোনও স্বপ্নজালে জড়িত হইয়া, অথবা লছমীপুর মামলার কোনও জটিল গ্রন্থির উন্মোচনের কথা ভাবিয়া, তাহা বলা কঠিন। তিনি কোনও রূপ মন্তব্য করিলেন না।

চা এবং খাবারের আয়োজনের প্রাচুর্য দেখিয়া খুসি না হইয়া পারিলাম না। রাত্রি জাগরণ এবং পথের ক্লান্তির উপর অমন পরিতৃপ্তির সহিত স্নান করার ফলে দেহের প্রদেশ বিশেষে যে দাপাদাপি আরম্ভ হইয়াছিল তাহার তাড়নায় ক্ষণপূর্বে কীর্তিত রিক্ততার মহিমা লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না। জৈব পরাক্রমের নিকট দার্শনিক মতবাদ যে-পরিমাণ পরাজয় স্বীকার করিল, সুধীজনের সমীপে তাহা স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করা রুচিসঙ্গত হইবে না।

চায়ের পর্যায় শেষ হইলে সুরু হইল সঙ্গীতের মজলিশ। তলব পড়িল আমারই উপর, এবং তদনুযায়ী হারমোনিয়ম পড়িল আমারই সম্মুখে। বাহিরে সূর্যকরোজ্জ্বল ধরিত্রী আনন্দের চক্রে নিরবসর আবর্তিত হইতেছিল। হারমোনিয়ম টানিয়া লইতে হঠাৎ মনে পড়িল

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দেশমাতৃকার বন্দনা, 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।'

শুনিয়াছি, একদিন প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হইয়া রবীন্দ্রনাথ পথ চলিতে চলিতে ভৈরবী রাগিণীর সূত্রে গাঁথিয়া গাঁথিয়া এই অপরূপ গানটির প্রায় সবটুকু বাণীই রচিত করিয়াছিলেন। পাছে ভুলিয়া যান এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া রচিত অংশটুকু কাগজে লিখিয়া লইয়া তিনি গানটি সমাপ্ত করেন। গতির সহিত গীতখানির নাড়ীর যোগ আছে স্মরণ করিয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতির উপর সওয়ার হইয়া এই গানখানিই আরম্ভ করিলাম।

আস্থায়ীর শেষাংশ 'অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী। জনক-জননী-জননী।' গাহিবার সময়ে সহসা একমুহূর্তে চাহিয়া দেখি, জানালার বাহিরে শ্যামল-অঞ্চলে অপরিমিত ফল-মূল-শস্যের পসরা ধারণ করিয়া প্রসন্নমুখে 'জনক-জননী-জননী' দাঁড়াইয়া আছেন। চিনিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইল না, ইঁহারই 'পুণ্যপীযূষস্তন্য' পান করিয়া যুগে যুগে আমাদের পিতৃপুরুষেরা লালিত হইয়াছেন। 'শুভ্রতুষারকিরীটিনী' রূপে ইঁহাকে দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবার জন্য দল বাঁধিয়া চলিয়াছি সুদূর মায়াবতী শৈলে। অননুভূতপূর্ব আনন্দ ও সম্ভ্রমের আবেগে সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা ডিস্ট্যান্ট সিগনালের পোস্ট-দ্রুতবেগে পিছন দিকে সরিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি মন্থর হইতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম আমরা বক্সার স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়াছি। গান বন্ধ করিয়া হারমোনিয়ম সরাইয়া রাখিলাম।

১১

মাত্র সাহাবাদ জেলার একটি মহকুমা হইলেও, তদনুপাতে বক্সার অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর। যাত্রীসমাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে গাড়ি আসিয়া থামিবামাত্র যাত্রীদের উঠা-নামার একটা বিপুল হৈ-চৈ পড়িয়া গেল ; এবং তাহার মধ্যে ফেরিওয়ালাদের 'পান-সিগ্রেট' 'চা-গ্রম্' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রামদানাকা লাড্ডু' 'কাশীকা চম্‌চম্' প্রভৃতি বিভিন্ন হাঁক-ডাক অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিল।

সুপুষ্ট চম্পকবর্ণাভ চম্‌চম্‌গুলি দেখিয়া পুলকিত হন নাই, এমন নিস্পৃহ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বেশি ছিলেন না, তীক্ষ্ণ অনুমান-শক্তির সাহায্যে বোধকরি সে কথা উপলব্ধি করিয়া কিছু চম্‌চম্ কিনিবার জন্য বাসন্তী দেবী আগ্রহান্বিত হইলেন।

আমি বলিলাম, "চম্‌চম্ কেনার সপক্ষে ভোট দিতে আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু কেনবার আগে অনুসন্ধান করা দরকার, চম্‌চম্‌গুলি কাশীধামের চম্‌চম্ অথবা কাশীরামের চম্‌চম্।"

সহাস্যে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কাশীরামের ত মহাভারতই আছে ; চম্‌চম্‌ও আছে নাকি ?"

আমি বলিলাম, "থাকতে পারে কি-না, একটা প্রচলিত গল্প শুনলেই বুঝতে পারবেন। কলকাতার কোনো পল্লীতে এক ফেরিওয়ালা প্রত্যহ সকালে বৈদ্যনাথের পেঁড়া ফেরি ক'রে বেড়াত। চা-পানের সময় মাখন-রুটির সঙ্গে একটা ক'রে পেঁড়া খাওয়ায় পাড়ার লোক অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। একদিন পাড়ার এক মাতব্বর ব্যক্তি ক্রুদ্ধ কঠোর স্বরে পেঁড়াওয়ালাকে বললেন, "ওহে বাপু, তোমার ওপর আমরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার পেঁড়া আর কেনা হবে না।" মুখ কাঁচুমাচু ক'রে পেঁড়াওয়ালা বললে, "কেন বাবুমশয়, আমার পেঁড়ায় কি কোন

দোষ পেয়েছেন ?" নিয়ত-টাটকা সুস্বাদু পেঁড়ার বিরুদ্ধে বাবুমশায়ের কোনো অভিযোগ ছিল না, বললেন, "পেঁড়ার দোষ না-ও যদি পেয়ে থাকি, তোমার দোষ পেয়েছি। তুমি ভণ্ড, প্রতারক!" সভয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে পেঁড়াওয়ালা প্রশ্ন করলে, "কেন হুজুর ?" মাতব্বর বললেন, "তুমি বদ্যিনাথের পেঁড়া বলে হেঁকে বেড়াও, আমাদের কি তুমি এতই বোকা পেয়েছ যে, আমরা বিশ্বাস করব প্রতিদিন বদ্যিনাথ থেকে তাজা পেঁড়া আনিয়ে তুমি বিক্রি কর ? লোক দিয়ে আনানো ত' দূরের কথা, পার্শেলে আনালেও পোষায় কখনো ছ'পয়সা ক'রে এক-একটা পেঁড়া বিক্রি করা ? এ পেঁড়া তুমি নিশ্চয় কলকাতায় তৈরি কর!" ভদ্রলোকের অভিযোগ শুনে ফেরিওয়ালার মুখ উজ্জল হ'য়ে উঠ্‌ল। হাত জোড় ক'রে বিনীতকণ্ঠে সে বললে, "বাবুমশয়, আপনার কথাও ঠিক, আমার ডাকও মিথ্যে নয়। এ পেঁড়া কলকাতাতেই তৈরি হয়, কিন্তু আমার নাম বদ্যিনাথ ঘোষ। কোনোদিন ত' দেওঘরের পেঁড়া ব'লে আমাকে হাঁকতে শোনেন নি। আমি প্রতারণা করিনি হুজুর!" কৈফিয়ৎ শুনিয়া ভদ্রলোক একটু হকচকাইয়া গেলেন। দেওঘরের পেঁড়া বলিয়া না হাঁকিয়া বদ্যিনাথের পেঁড়া বলিয়া হাঁকিলে হয়ত তেমন স্থূল প্রতারণা হয় না, কিন্তু তথাপি একটা যে সূক্ষ্ম এবং চতুর প্রতারণা করা হয় তাহা প্রতিপন্ন করা সময় এবং বিতর্ক সাপেক্ষ। সুতরাং সে অসুবিধাজনক পথে পদার্পণ না করিয়া ভদ্রলোক সেদিন কিছু বেশি করিয়াই পেঁড়া কিনিয়াছিলেন। এখানকার ফেরিওয়ালকে চেপে ধরলে সে-ও হয়ত বলতে পারে, 'হুজুর, এ চম্‌চম্ বক্‌সারেই তৈরি হয়েছে, তবে আমার নাম কাশীরাম সাউ।"

মিলিত কণ্ঠের একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

আমাদের মধ্যে একজন বোধহয় চম্‌চম্‌গুলির প্রতি একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; ঈষৎ অনুযোগের সুরে তিনি বলিলেন, "পেঁড়ার গল্পটা আপনি যদি একটু পরে করতেন, তা হ'লে চম্‌চম্-

ওয়ালাকে চেপে ধরাও যেতে পারত, আর শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছু চম্‌চম্‌ কেনাও সম্ভব হ'ত।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু এ ধ্বনি যেন নিছক কৌতুকের ধ্বনিই নহে,—একটা যেন নিরক্ষর সমর্থন এবং প্রচ্ছন্ন ক্ষোভের সুরও ইহার সহিত জড়িত। অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চম্‌চম্‌ওয়ালা চ'লে গেছে না-কি?"

সহাস্য মুখে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "চলে না গিয়ে আপনার পেঁড়ার গল্পে জ'মে থাকলে বুঝতাম শুধু তার চম্‌চম্‌ই রসালো নয়, সে নিজেও রসিক।"

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া প্ল্যাটফর্মের তরলীভূত জনতার মধ্যেও চম্‌চম্‌ওয়ালার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। চম্‌চম্‌ কেনা না হওয়ায় যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সান্ত্বনার্থে বলিলাম, "দুঃখ কি? আমরা ত' খাস কাশীধাম হ'য়েই যাব,—সেখানে চম্‌চম্‌ কিনলে সে চম্‌চম্‌ কাশীরাম বিক্রী করলেও কাশীর চম্‌চম্‌ই হবে।"

এ আশ্বাসন বিশেষ ফলদায়ক হইল বলিয়া মনে হইল না,—কারণ বুদ্ধিমান লোকেরা জানে, A bird in hand is worth two in the bush। কাশীধামের অত্যধিক ভিড়ের মধ্যে যদি সহজে তথাকার চম্‌চম্‌ওয়ালার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাশীর প্ল্যাটফর্ম ত' সত্যসত্যই bush হইয়া উঠিবে।

ক্ষণপরে গাড়ি ছাড়িলে দেখি, প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম প্রান্তে একস্থানে বাঁশের বৈঠকের উপর অবিক্রীত চম্‌চমের থালাটি রাখিয়া চম্‌চম্‌ওয়ালা, বেচিবার যতটুকু সম্ভাবনা গাড়ির মধ্যে ছিল সবটুকুই কাজে লাগাইয়াছে ধারণা করিয়া, চলমান গাড়ির দিকে চাহিয়া নির্বিকারচিত্তে দাঁড়াইয়া আছে। লগ্ন তখন কিন্তু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা ইসারা করিলেও গাড়ির গতিকে পরাভূত করিয়া তাহার পক্ষে চম্‌চম্‌ বিক্রয় করা, এবং আমাদের পক্ষে দাম দেওয়া, কোনোটাই সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের মারফৎ যেটুকু লাভ তাহার হইতে পারিত, অদৃষ্ট দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও না-জানার কল্যাণে খুসি হইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া একটা তরল করুণায় মন ভরিয়া উঠিল।

বেলা নয়টার পর আমরা মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছিলাম। এইখানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাঞ্জাব মেল হইতে আমাদের কামরা কাটিয়া লইয়া আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের পাঞ্জাব মেলে জুড়িয়া দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, টুরিষ্টকার রেল-কোম্পানির চূড়ান্ত ব্যাপার বলিয়া খাতির তাহার অত্যন্ত বেশি। ভাড়ার হিসাবে প্রথমশ্রেণী হইতে যেটুকু ইহার পার্থক্য, মর্যাদার দিকে তদনুপাতে পার্থক্য অনেক বেশি। কোম্পানীর পাটরাণী বলিয়া সকলেই তাহার পরিচর্যায় তৎপর। জন-দুই ঝাড়ুদার আসিয়া গাড়ি, মায় ল্যাভেটারি প্রভৃতি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল, ব্যবহারের ফলে স্নান, পান প্রভৃতির জলের ভাণ্ডার যেখানে যতটুকু কমিয়া গিয়াছিল পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং একাধিকবার দুই-একজন করিয়া উচ্চ রেলকর্মচারী আসিয়া আসিয়া আমাদের সুখ-সুবিধা অভাব-অভিযোগের বিষয়ে খবর লইয়া গেল।

চূড়ান্তের প্রতি আনুগত্যের এই একান্ত নিষ্ঠা আমাদের বিচার-বিবেচনার মধ্যে মজ্জাগত। যাহা অগ্রীয়, যাহা সর্বোচ্চ, তাহার প্রতি আমাদের মনোবৃত্তিও অত্যুচ্চ। আমরা যে পা ছুঁইয়া প্রণাম করি, তাহাতে পায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়, তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত হয় মাথার প্রতি। আমার চেয়ে যে উচ্চ, আমার পক্ষে তার পা ছোঁয়াই চলে, মাথা ছোঁয়া চলে না। এ কথা শুধু যে আঙুল-বিঘৎ-হাতের দীর্ঘতার বিষয়েই খাটে তাহা নহে, মহিমার উচ্চতার বিষয়েও খাটে। প্রণাম আমরা পায়ে করি, আশীর্বাদ করি মাথায়। শুধু লৌকিক জগতেই নহে, বিশ্বজগতেও শিখরের প্রতি এই পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। অস্তাচলগামী সূর্য্য তাহার শেষ রশ্মির অভিবাদন শুধু পর্বতের শিখরকেই জানাইয়া যায়, পাদদেশকে নহে।

মোগলসরাই হইতে গাড়ি ছাড়ার পর হঠাৎ এক সময়ে চাহিয়া দেখি দুইখানা টেবিল জুড়িয়া আমাদের জন্য আহার-পাত্র পড়িয়াছে। কিছু পূর্বে বাসন্তী দেবী যে-আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা বুঝি অক্ষরে-অক্ষরেই ফলিতে চলিল! পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখি, বেলা তখন মাত্র সাড়ে দশটা। ইহারই মধ্যে তাহা হইলে খাইতে বসিতে হইল।

অবশ্য, গাড়ির সাড়ে দশটা নেহাৎ কম বেলাও নহে। গাড়ির বেলা এবং রাত্রি বাড়ির বেলা এবং রাত্রি অপেক্ষা খানিকটা দ্রুত চলে। বাড়ির দ্বিপ্রহরকাল গাড়িতে বেলা সাড়ে দশটার সময়েই দেখা দেয়, এবং শয়ন করিবার একটু যুত পাইলে রেলগাড়ীর যাত্রী রাত্রি দশটার মধ্যেই বেশ এক ঘুম দিয়া উঠিয়া বসে। নিষ্কর্মা বেকার মানুষের ঘণ্টা সাধারণ ঘড়ির চল্লিশ মিনিটেই শেষ হয়। সুতরাং গাড়িতে বেলা সাড়ে দশটার সময়ে ভোজন-পাত্র পড়িলে অসঙ্গতভাবে আগে পড়িয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা ঠিক চলে না। আমরাও সেই বিবেচনার বশবর্তী হইয়া সে অভিযোগ করিলাম না।

এ দিকে মোগলসরাইয়ের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গাড়ি ডফরিণ ব্রিজের উপর সওয়ার হইয়া গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অদূরে বারাণসী মহানগরী তাহার মন্দির-মিনার মসজিদের মহিমময় সমৃদ্ধি লইয়া অর্ধচক্রাকারে দেখা দিয়া আগাইয়া আসিতেছে। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর জনতা, মন্দিরে মন্দিরে পুণ্যার্থী-পুণ্যার্থিনীর। ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র তীর্থরাজ কাশীর রৌদ্রস্নাত অধ্যাত্ম মূর্তি ক্ষণকালের জন্য আমাদের মনকে গভীর চেতনায় আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

পুল শেষ হইয়া রাজঘাট ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আহারের ডাক পড়িল। গাড়ির সাড়ে দশটা ও বাড়ির সাড়ে দশটা ঠিক এক নহে, এই কথা ভাবিয়া, টেবিলে আহার পাত্র পড়ায় আপত্তি

করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। এখন কিন্তু টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সহসা পাকাশয়ে যে বিশেষ-এক অনুভূতি মোচড় দিয়া উঠিল, নিঃসন্দেহে বুঝিলাম তাহা ক্ষুধা। ক্ষণকাল পূর্বে গুরুভার উপকরণের সহিত চা-পর্ব শেষ করিবার এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ক্ষুধা কোথা হইতে উপস্থিত হইল ভাবিয়া শুধু বিস্মিত হইলাম না, লজ্জিতও হইলাম। বুঝিলাম, ক্ষুধা বিড়াল জাতীয় বস্তু ; শাক-ভাত দেখিলে যে-ক্ষুধা লেজ-গুটাইয়া পাকাশয়ের সুদূর গুহায় দার্শনিক বৈরাগ্যের সহিত নির্বিকারে বসিয়া থাকে, মাছ-ভাত দেখিলে তাহা আগাইয়া আসে।

আহার্য বস্তুর বৈচিত্র্য এবং উপাদেয়তার মধ্যে কাশীর চম্‌চম্ নিঃশব্দে ডুবিয়া মরিয়াছে যখন আমরা টের পাইলাম, তখন আর চারা ছিল না, তখন পাঞ্জাব মেল ক্যাণ্টনমেণ্ট্ স্টেশনের পশ্চিম ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য আস্বাদনে যখন আমরা মগ্ন ছিলাম তখন সামান্যতর কাব্যের কথা আমাদের মনে পড়ে নাই। দৈব প্রসন্ন হইয়া আমাদের পাত্রে যাহা জুটাইয়াছিল, তাহার প্রসাদে আমাদের মনে কাশীর চম্‌চমের জন্য বিশেষ কোনো ক্ষোভের পরিচয় পাওয়া গেলনা। একমাত্র পাওয়া গেল আমাদের মধ্যে একজন যিনি ছিলেন মিষ্টরসের ঐকান্তিক রসিক, সেই ললিত-বাবুর মন্তব্যের মধ্যে। কতকটা ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বক্‌সারের চম্‌চম্ কিন্তু কাশীর চম্‌চম্‌ই ছিল।"

শুনিয়া আমরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। ললিতবাবুর মন্তব্যের বাণী যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যঞ্জনা তাহার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে। কাশী এবং ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ স্টেশনে চম্‌চম্ কিনিবার কথা ভুলিয়া থাকার জন্য তাহার মধ্যে ক্ষোভের পরিচয় ত' নিশ্চয়ই ছিল,—অধিকন্তু, বক্‌সার স্টেশনে বদ্যিনাথের পেঁড়ার গল্প ফাঁদিয়া চমচমওয়ালাকে হারাইবার হেতু হওয়ার জন্য আমার প্রতি অবিমৃষ্যকারিতার দোষারোপও ছিল কম নহে।

আহারের পর ক্ষণকাল যথারীতি আল্গা গল্প-গুজব চলিল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নহে। সময়ে সময়ে অনুত্তর এবং কখনো কখনো উত্তরের অসংলগ্নতার দ্বারা সেই আল্গা গল্প মুহুর্মুহু খণ্ডিত হইতে লাগিল; অর্থাৎ বোঝা গেল, পূর্বরাত্রের অনিদ্রার উপর পাকাশয়ে পরিপূর্ণ আহারের চাপ পড়িয়া সকলেরই চক্ষে তন্দ্রার আবেশ নামিয়াছে। তদুপরি, অত্যুৎকৃষ্ট স্প্রীং-প্রসূত মৃদু-মধুর দোলানি ত' আছেই। এইরূপ তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় এমন কোনো জোরালো গল্প খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা যাহা সকলকে জাগাইয়া রাখিতে সক্ষম। দেখিতে দেখিতে একের পর একে সকলেই নিজ নিজ শয্যায় নিদ্রার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

আমি হয়ত স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের মুখে শোনা বিরূপাক্ষ মজুমদারের কাহিনীর অবতারণা করিয়া আসর জমাইয়া রাখিতে পারিতাম; কিন্তু উত্তেজক বস্তুর দ্বারা অপরের নিমীলনোন্মুখ চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া রাখা অপেক্ষা নিজের নিমীলনোন্মুখ চক্ষুকে নিমীলিত করা অধিক বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিয়া আমিও শুইয়া পড়িলাম।

সে যাহা হউক, উপস্থিত বিরূপাক্ষ মজুমদারকে হাজির করিলে পাঠকগণের পক্ষে কৌতূকোদ্দীপক হইবে মনে করিয়া কাহিনীটি এখানে বিবৃত করিলাম।

১৩

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা।

বঙ্গদেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ জেলার অন্তর্গত একটি বৃহৎ ঝিলের জলকর স্বত্ব লইয়া প্রবলপরাক্রান্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া উভয় পক্ষে কিছু খুন-জখম হইয়া গেল। ঘটনার পর ব্যস্ত হইয়া উভয় পক্ষ থানায় ছুটিল যথাসম্ভব শীঘ্র এত্তেলা দিবার জন্য, এবং এত্তেলার ফলে অবিলম্বে বিরূপাক্ষ মজুমদার নামে একজন প্রবীণ জাঁহাবাজ ইন্সপেক্টর সদলবলে অকুস্থলে আসিয়া ধড-পাকড আরম্ভ করিল। তাহার পর যথারীতি লাশ ও আসামী চালান দিয়া সরেজমিন তদন্ত করিয়া এবং অপরাপর বিধি-ব্যবস্থা সারিয়া সদরে ফিরিয়া গেল রিপোর্ট লিখিবার জন্য।

এখন, এই রিপোর্টের উপর ভবিষ্যৎ মকর্দ্দমার গতি-বিধি ও পরিণতি বেশ খানিকটা নির্ভর করিবে বলিয়া উভয় পক্ষের বিশ্বাস। সুতরাং রিপোর্ট যাহাতে নিজ নিজ পক্ষের অনুকূল হয়, সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই মোটা অঙ্কের টাকার থলি লইয়া ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করিয়া সদরে আসিয়া আপন আপন কাছারিতে আড্ডা গাড়িল।

চা পান এবং জলযোগ সারিয়া সন্ধ্যার পর বিরূপাক্ষ তাহার কোয়ার্টার্সের একটু ভিতর দিকের প্রাইভেট চেম্বারে ফাইল খুলিয়া কাজে বসিয়াছে, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছে। নির্বাণপ্রায় বর্মাচুরুটে দুইটা টান দিয়া ভাল করিয়া ধরাইয়া লইয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "ডেকে নিয়ে আয় এখানে।"

ক্ষণকাল পরে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাত-খানেক মাথা নোয়াইয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। খর্ব্বকায়, ঈষৎ স্থূল শরীর, এবং আধখানা মাথা জুড়িয়া টাক।

সম্মুখস্থ একটা চেয়ার দেখাইয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "বসুন।"

কুণ্ঠিত ভাবে আগন্তুক চেয়ারের একটা সামান্য অংশে আলগাভাবে উপবেশন করিলে বিরূপাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম আপনার ?"

"আজ্ঞে আমার নাম রতনচাঁদ হাজরা।"

"কি চাই বলুন ত ?"

দুইহাত কচলাইয়া মুখ ঈষৎ কাঁচুমাচু করিয়া রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, একটু অনুগ্রহ।"

অ্যাশ-ট্রে হইতে চুরুটটা তুলিয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলিল, "বেশ কথা। কিন্তু, করতে পারি ত' আমি ?"

সহসা এ কথার তাৎপর্য ধরিতে না পারিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতে পারেন হুজুর ?"

"অনুগ্রহ ?"

আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহ সহকারে রতনচাঁদ বলিল, "কলমের এক খোঁচায়।"

"তা হ'লে হাঁসপুকুরের কেসেই না-কি ?"

সোৎসাহ ঘাড় নাড়িয়া রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, হাঁসপুকুরের কেসেই।"

"কোন্ পক্ষ ?"

"আজ্ঞে, কাপাসগাছা।"

মুখে-চক্ষে ঈষৎ বিমূঢ়তার ভাব ফুটাইয়া বিরূপাক্ষ এক মুহূর্ত নির্বাক রহিল, তাহার পর নাক দিয়া এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "কঠিন কাজ। এনেছেন ?"

"কি ?"

"ঘুষ ?"

অপ্রতিভ মুখে ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত রতনচাঁদ বলিল, "ও কথা বলবেন না হুজুর।"

"তবে কি অমনি-অমনিই অনুগ্রহ করাতে চান ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, অমনি-অমনি নয়, হুজুরের জন্যে কিছু সেলামি এনেছি।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "ও ! সেলামি এনেছেন। গোলাপকে গোলাপ ফুল না ব'লে টগর ফুল বললে, গোলাপের রঙ সাদা হ'য়ে যায়, না লালই থাকে হাজরা মশায় ?"

ঈষৎ অপ্রতিভ-স্মিতমুখে রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, লালই থাকে।"

"তা হ'লে ঘুষকে সেলামি বললে ঘুষের রঙও লালই থাকে। সে যা হোক্, আমাকে যে ঘুষ দিতে এসেছেন, এর আগে আমাকে কখনো ঘুষ দিয়েছেন কি ?"

"আজ্ঞে, না হুজুর, তা কখনো দিই নি।"

"ঘুষখোর ব'লে বাজারে কি আমার খুব দুর্নাম শুনেছেন ?"

ইন্সপেক্টর একজন ঘাগি লোক হইতে পারে, কিন্তু রতনচাঁদও ঘুঘু ব্যক্তি ; বলিল, "বাজারে আপনার সুনামই শুনেছি হুজুব।"

এই আপাতমধুর প্রশস্তির মধ্যে যে গোপন দংশনটুকু ছিল তাহা নির্বিবাদে পরিপাক করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "তা যদি শুনেছেন, তা হ'লে বেলাশেষে এই বৃদ্ধ সাধুপুরুষকে নষ্ট করতে এসেছেন কত টাকার জোরে শুনি ?"

এ কথা শুনিয়া রতনচাঁদ খুসি হইল, এ কাজের কথা ; বলিল, "হাজার এক টাকা হুজুরে নিবেদন করব।"

শুনিয়া বিরূপাক্ষ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওঃ! কত বড় মাঙ্গলিক কাজ যে, অন্তে শূন্য থাকলে চলবে না। হাজার এক টাকা! একটা কথা শুনেছেন হাজরা মশাই ?"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রতনচাঁদ বলিল, "কি কথা হুজুর ?"

"জাতও গেল, পেটও ভরল না ?"

"আজ্ঞে, শুনেছি।"

"হাজার এক টাকা নিবেদন করলে দেবতার জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। বলি, পুলিশই হই, আর যা-ই হই, শেষ পর্যন্ত বামুন মানুষ ত? পাঁচ হাজার নিবেদন করতে হবে, পুরোপুরি।"

ব্যস্ত হইয়া হাত জোড় করিয়া রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, তা হ'লে আমরা কিন্তু মারা যাব।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "মারা যাওয়াই ত' উচিত। ও পক্ষের একটা লোককে প্রাণে মেরেছেন, গোটা দুইকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে জখম করেছেন, আপনাদের পক্ষে একজন যদি না ঝুল্‌ল, আর এক-আধজন যদি সমুদ্র-যাত্রা না করল, তা হ'লে সুবিচার হ'ল বলতে পারেন?"

বেগতিক দেখিয়া রতনচাঁদ বলিল, "ও পক্ষও ত' আমাদের লোককে মেরেছে আর জখম করেছে হুজুর।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "সে জন্যে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই; ও পক্ষও ঝুলবে আর সমুদ্রযাত্রা করবে। আপনি চান ওরাই ঝোলে, আর আপনারা বাড়ি ফিরে আসেন। এই ত?"

দুই হাত কচলাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে স্মিতমুখে রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর, ঠিক তাই।"

"তার উপযুক্ত পথ করা কঠিন কাজ হাজরা মশায়। শুধু 'হয়' কে 'নয়' করলেই চলবেনা, 'নয়'-কেও 'হয়' করতে হবে। খাট্‌নি আছে। হাজর-একে হবেনা, পাঁচ হাজারই দিতে হবে।"

তখন টাকা লইয়া কষা-মাজা আরম্ভ হইল। একদিকে হাজার টাকা এবং অপর দিকে পাঁচ হাজার,—এই দুই প্রত্যন্তের মধ্যে দুলিতে দুলিতে অবশেষে সংখ্যা তিন হাজারের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিরূপাক্ষ বলিল, "তা হ'লে সব টাকাটাই এখনি দিয়ে যাচ্ছেন ত? এ কাজে ধারে কারবার বা বাকি-বকেয়া নেই, তা নিশ্চয় জানেন?"

"আজ্ঞে, সব টাকাই দিয়ে যাচ্ছি। বাইরে গাড়িতে আছে, এনে দিচ্ছি।"

"বেশ কথা। কি রকমে দিচ্ছেন বলুন ত?"

"আজ্ঞে, দশ-দশ টাকার নোটে।"

"উত্তম।"

বাহিরে গিয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া রতনচাঁদ কাপড়ের ভিতর হইতে তিন তাড়া নোট বাহির করিয়া বিরূপাক্ষর হাতে দিয়া বলিল, "প্রত্যেক তাড়ায় একশ' খানা ক'রে আছে, একটু দেখে নিন হুজুর।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "দেখতে হবে না, ঠিক আছে। ঘুষের টাকায় কেউ কারচুপি করেনা। এখন তা হ'লে আসুন, আমি কাজে হাত দিই।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রতনচাঁদ বলিল, "একটা কথা আছে হুজুর।"

"বলুন।"

"কপি নেওয়ার পর যদি দেখি আপনার রিপোর্ট সম্পূর্ণ আমাদেব মনের মতো হযেছে, তা হ'লে আরও পাঁচ শ' টাকা আপনাকে দেবো।"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "বকশিস? আজ্ঞে, ও পদার্থ নিই নে, পারিশ্রমিকই নিই। তবে যদি আপনার মনের মধ্যে এমন কোনো কুণ্ঠা হ'য়ে থাকে যে, অন্যায ভাবে কষা-মাজা ক'বে আমাকে পাঁচ শ' টাকা কম দিযেছেন, ও টাকাটা পুরিযে দিলেই আমাকে ঠিক মতো খুসি করা হয়, তা হ'লে না হয আর পাঁচ শ টাকা দিয়েই যান। এ সব কাজে মনে কুণ্ঠা রাখতে নেই হাজরা মশায!"

বেগতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইযা উঠিয়া হাজরা বলিল, "আজ্ঞে না, না, সে কি কথা! আপনার মতো মহাশয় ব্যক্তির কাছে আশ্বাস পেলে মনে কখনো কুণ্ঠা থাকতে পারে? আচ্ছা, তা হলে আসি?"

"আসুন।"

রতনচাঁদ প্রস্থান করিবার ক্ষণকাল পরেই পূর্বোক্ত ভৃত্য আসিয়া বলিল, "আর একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "ডেকে আন এখানে।"

এবারও প্রবেশ করিল এক খর্বকায় ব্যক্তি, কিন্তু ইহার মাথায় একমাথা কাঁচা-পাকা চুল, টিকালো নাসিকার দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চক্ষু। রতনচাঁদেরই মতো নত হইয়া অভিবাদন করিল।

চেয়ার দেখাইয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "বসুন"।

ভদ্রলোক উপবেশন করিলে বিরূপাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম আপনার?"

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম বনমালী মণ্ডল।"

"কি প্রয়োজন?"

মুখে চক্ষে ব্যগ্রতার ভাব ফুটাইয়া দুই হাতে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বনমালী বলিল, "আজ্ঞে, একটু আপনার অনুগ্রহের প্রয়োজন।"

"অনুগ্রহটা কি ধরণের? এমনি আলগা অনুগ্রহ, না কোনো কেস সংক্রান্ত?"

"আজ্ঞে, কেস সংক্রান্ত।"

"আলগা অনুগ্রহে মাশুল লাগেনা, কিন্তু কেস সংক্রান্ত অনুগ্রহে মাশুল লাগে মণ্ডল মশায়।"

পুনরায় দুই হাতে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে বনমালী বলিল, "মাশুল দোব।"

দিয়াশলাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "বুঝেছি। করিমপুর বিলের মামলা।"

মাথা নাড়িয়া বনমালী বলিল, "আজ্ঞে না, করিমপুর বিলের মামলা নয়।"

"তবে?"

"হাঁসপুকুরের মামলা।"

মুখমণ্ডলে হতাশার ভাব আনিয়া নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলিল, "নাঃ! আজ দেখছি লোকসানের পালা। সকালে বউমা একটা

সোনার হার হারিয়েছেন ; একটু আগে আপনাদেরই একজন কর্মচারী এসে নিতান্ত শস্তা মাশুলে মাত্র তিন হাজার টাকায় হাঁসপুকুরের মামলার ব্যবস্থা করে গেলেন, ,—ভাবলাম আপনি যদি করিমপুর মামলায় এসে থাকেন তা হ'লে এ দুটো বাবতের লোকসান কতকটা পুরিয়ে দেবেন আপনি।"

বিরূপাক্ষের কথা শুনিতে শুনিতে বনমালী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল ; বলিল, "আমাদের কর্মচারী টাকা দিয়ে গেছে ?"

"মাত্র আধ ঘণ্টা আগে। কিন্তু সে জন্যে আপনার মুখ শুকচ্ছে কেন ? খুব ত শস্তায় কাজ সেরে গেছে মশায়। আপনাদের দিকটা অপেক্ষাকৃত ভাল ব'লে আর বেশি পেড়াপেড়ি করলাম না, তিন হাজারেই রাজি হলাম।"

চিন্তিতমুখে বনমালী বলিল, "আমরা কোন্ দিক বলুন ত ?"

সহজসুরে বিরূপাক্ষ বলিল, "কেন, কাপাসগাছা ?"

মাথা নাড়িয়া বনমালী বলিল, "আজ্ঞে, না , তারা আমাদের শত্রু-পক্ষ ! আমরা বকুলডাঙ্গা।"

"কি সর্বনাশ।" বিরূপাক্ষ হাত হইতে চুকটটা অ্যাশ-ট্রের উপর স্থাপন করিল।

পাংশুমুখে বনমালী বলিল, "কেন স্যার ?"

"আপনাদের বাঁশ যে বেজায় বেঁকা, সিধে করতে অনেক তাপ আর তেলের দরকার ! ভাগ্যে আপনারা আগে আসেননি ! তিন হাজারই আমার ভাল।"

বনমালী বলিল, "কিন্তু ওদের বাঁশও ত সিধে বাঁশ নয়।"

"সিধে না হ'তে পারে, কিন্তু আপনাদের মতো এত বেঁকাও নয়। কি আশ্চর্যের কথা বলুন ত ? আগে যাদের ছুটে আসা দরকার, তারা রইল ব'সে, আর ওরা এসে কেল্লা ফতে ক'রে চ'লে গেল।"

বনমালী বলিল, "আমরা আলিস্যি ক'রে বসে থাকিনি স্যার। আমরা

ভেবেছিলাম, আপনি অফিস থেকে এসে চা-টা খেয়ে একটু বিশ্রাম করবেন, তার পর আস্‌ব।"

হাসিয়া উঠিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "কি সর্বনাশ! অত দয়া-দাক্ষিণ্য করতে গেলে কখনো কাজ চলে? মাশুল যখন দেবেন তখন ভয়টা কিসের শুনি? কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে কেল্লা ফতে করবেন।" তাহার পর করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিল, "ভবিষ্যতে সাবধান হবেন। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসুন।"

ব্যস্ত হইয়া বনমালী বলিল, "ও কথা বললে চলবেনা স্যার।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "চলে না ত সংসারে অনেক কিছুই। আপনাদের গাড়িও চলবে না, আপনাদের গাড়িতে চাকা নেই।"

"চাকা আপনাকে তৈরি করতে হবে।"

"অত বড় মিস্ত্রী আমি নই, তা ছাড়া ওদের দশা কি হবে?"

"ওদের টাকাটা ফেরৎ দিন।"

"ওরা যদি ফেরৎই নেবে, তা হ'লে দেবে কেন টাকা? ওরা টাকা বাঁচাতে চায় না, ওরা চায় নিজেদের বাঁচাতে, আর আপনাদের মারতে।"

এই যৎপরোনাস্তি উদ্বেগজনক উক্তির পর অনেক কথাবার্তা বাদানুবাদ হইল। শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষ বকুলডাঙ্গার অচল রথে চক্র যোজনার কার্যে স্বীকৃত হইল,—পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে।

ঠিক রতনচাঁদ হাজরারই মতো দশ টাকার নোটে হিসাব করিয়া পাঁচ হাজার টাকা গণিয়া দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বনমালী বলিল, "ওদের তিন হাজার টাকা তা হ'লে ফেরৎ দেবেন স্যার।"

"কি সর্বনাশ! তা নয় ত' দুটো রিপোর্ট লিখব না-কি? একটা তিন হাজারের সপক্ষে আর আর-একটা পাঁচ হাজারের?" বলিয়া বিরূপাক্ষ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

"না, তা-কি আর হয়।" বলিয়া বনমালী মণ্ডল বিরূপাক্ষকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

পথে কাপাসডাঙ্গার গুপ্তচর অলক্ষিতে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল, চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বনমালী মণ্ডলকে সোৎসাহে গাড়িতে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সে বুঝিল, বনমালীর মেজাজ অবসন্ন নহে, সুবিধা সে নিশ্চয় করিয়াছে। ঘাঁটিতে আসিয়া সংবাদ দিতে রতনচাঁদ চিন্তিত হইল। সেদিন রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছিল, পরদিন সন্ধ্যার পর সে বিরূপাক্ষের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিল।

রতনচাঁদকে দেখিয়া বিরূপাক্ষ যেন হাতে চাঁদ পাইল। হৃষ্টকণ্ঠে বলিল, "এসেছেন হাজরা মশায়? বাঁচিয়েছেন।"

চিন্তিতমুখে রতনচাঁদ বলিল, "কেন হুজুর?"

"ও তিন হাজার টাকা ফেরৎ নিয়ে যান।"

"ফেরৎ কেন?"

"আপনাদের পক্ষে অনেক ঝামেলা, রাতকে দিন করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কাজ নেই হাজরা মশায় সামান্য তিন হাজার টাকার লোভে। দু' পক্ষের সাক্ষী সাবুদ দেখে বুদ্ধি-বিবেচনায় সহজে যা মাথায় আসে লিখে দিই।"

রতনচাঁদ বলিল, "অপ্রকৃত কথা ব'লে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করবেন না হুজুর। কিসে আপনি খুসি হন বলুন।"

"তিন হাজার টাকা আপনি ফেরৎ নিয়ে গেলে।"

বাজে কথা আজ কহিবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রতনচাঁদ আসিয়াছিল; বলিল, "আমি জানি, বনমালী মণ্ডল কাল আপনাকে টাকা দিয়ে গেছে।"

"ও! জানেন? কত দিয়ে গেছে, তাও জানেন না-কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও জানি। এসব খবর আমরা ওদের লোকের কাছেই পেয়ে থাকি। ওরাও আমাদের লোকের কাছে আমাদের খবর পায়।"

"চমৎকার ব্যবস্থা কত দিয়ে গেছে, বলুন ত ?"

"পাঁচ হাজার।"

"তবে ত' কথাটা খুব সহজেই সরল হ'য়ে গেল। পাঁচের ওপব আপনারা উঠতে চান ? না, টাকাটা ফেরৎ নিয়ে যাবেন ?"

"টাকা ফেবৎ নেব কি হুজুব। টাকা যদি ফেরৎই নোব, তা হ'লে কাল তিন হাজাব টাকা দিয়ে গেলাম কেন ?—টাকা ত' আমরা চাইনে, আমরা চাই কাজ।"

"তবে পাঁচের উপব উঠবেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, অগত্যা উঠতেই হবে।"

"কত উঠবেন ?"

"পাঁচ শ'।"

ধীবে ধীবে মাথা নাড়িয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "নিন্দে হ'য়ে যাবে হাজরা মশায়। আপনাদের ওপব ওবা দু হাজাব উঠেছে, আব ওদেব ওপব আপনাবা পাঁচ শ' উঠলেই আমি যদি আপনাদের পক্ষে বাজি হই, তা হ'লে লোকে আমাকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলবে। ঘুষই নিই, আর যাই কবি, ধর্ম ত আছে ? নিন্দে হ'য়ে যাবে।"

"তবে কি বলছেন হুজুব ?"

"ওদের মতো দু হাজার উঠে পুরোপুরি সাত হাজার ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে যান।"

বিরূপাক্ষের কথা শুনিয়া বতনচাঁদ আঁৎকাইয়া উঠিল, "ও কথা বললে মারা যাব হুজুব। ও কথা বলবেন না।" তাহাব পর কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির কবিয়া কহিল, "এর মধ্যে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে হবে। দয়া ক'রে নাচার করবেন না হুজুর।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "কত আছে ওতে ?"

"আজ্ঞে, তিন হাজার।"

বিরূপাক্ষ 'লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ' মতের লোক, ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, "তবে তাই দিন। আপনারাই আমার কাছে আগে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের হ'য়ে কাজ ক'রতে পারলেই আমি খুসি হই।"

তিন হাজার টাকা বুঝাইয়া দিয়া রতনচাঁদ বলিল, "এরপর কিন্তু আর কোনো গোলমেলে কথা উঠলে রক্ত-গঙ্গা হব হুজুর।"

বিরূপাক্ষ কহিল, "না না, তাই কখনো হয়। সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে ত। আর দিন ছয়েকের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দাখিল করতেই হবে। এখনি সুরু না করলে দেরি হ'য়ে গেলে বদনাম হবে হাজরা মশায়। কি বলছেন আপনি?"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রতনচাঁদ বলিল, "কাল সন্ধ্যায় একবার আসব কি হুজুর?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "ক্ষতি কি? পায়ে পায়ে একবার না-হয় আসবেন। এসে হয় ত' দেখবেন রিপোর্ট বেশ খানিকটা লেখা হ'য়ে গেছে। আর, যতটা লেখা হয়েছে তার মর্ম অবগত হ'য়ে খুসি হ'য়েই যাবেন।"

নত হইয়া অভিবাদন করিয়া রতনচাঁদ প্রস্থান করিল।

পরদিন কিন্তু সন্ধ্যায় আসিয়া খুসি হইবার পরিবর্তে ইন্‌স্পেক্টর মজুমদারের গভীর-বিরস মুখ দেখিয়া রতনচাঁদ আতঙ্কিত হইল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "খানিকটা রিপোর্ট লেখা হয়েছে ত হুজুর?"

গভীর স্বরে বিরূপাক্ষ বলিল, "আরম্ভও হয় নি।"

"কেন?"

"আপনাদের অত্যাচারে!"

"মানে?"

"মানে, কাল আপনি যাওয়ার ঘণ্টা দেড়েক পরেই বনমালী মণ্ডল এসে দু হাজার টাকা দিয়ে ওদের অঙ্ক সাত হাজারে তুলে দিয়ে গেল।"

"আপনি দু হাজার টাকা নিলেন কেন ?"

"ঠিক এই প্রশ্নই বনমালী মণ্ডলও আমাকে করেছিল, 'আমাদের সঙ্গে পাঁচ হাজারে স্থির করবার পর আবার ওদের কাছে তিন হাজার টাকা নিলেন কেন'। উত্তরে কি বলেছিলাম জানেন ?"

রতনচাঁদ হাজরা দুর্দ্দান্ত জমিদার ঘরের জাঁহাবাজ কর্মচারী, ধৈর্য তাহার যথেষ্ট, এবং ধৈর্যকে সে মূল্যবান অস্ত্রের মতো ব্যবহার করিতে জানে। কিন্তু সে ধৈর্যও বোধকরি সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। বিরূপাক্ষের প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলিয়া অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার সত্যই রাগ হইয়াছে।

শান্তকণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলিল, "বলেছিলাম, কাপাসগাছাদের কাছে টাকা নিয়েছিলাম শুধু চক্ষুলজ্জার জন্যে। বিধাতা ত' কেবল চক্ষু দিয়েই নিরস্ত হন নি, চক্ষুলজ্জাও যে দিয়েছেন।"

শুনিয়া রতনচাঁদের পিত্ত পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। ও কথার কোনও উত্তর না দিয়া অসরস কণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু এইভাবে আপনি যদি ক্রমাগত নিলাম চালাতে থাকেন, তা হ'লে এর শেষ কোথায় বলুন ত ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলিল, "রাগ আপনার হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে অযথা কথা বলবেন না হাজরা মশায়। নিলাম আমি চালাচ্ছি ? না, আপনারা চালাচ্ছেন ? আমাকে, অথবা আমার ভবিষ্যৎ রিপোর্টকে নিলামের লাটে দাঁড় করিয়ে আপনি হাঁকছেন তিন হাজার ত' ওরা হাঁকছে পাঁচ হাজার। আপনি হাঁকছেন ছ হাজার ত' ওরা হাঁকছে সাত হাজার ! আচ্ছা, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় ত' পথ থেকে যে কোন লোককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন, কে নিলাম চালাচ্ছে —আমি, না আপনারা। আপনারা এসে ডাকাডাকি না করলে নিলাম ত' আর আপনি-আপনি চলতে পারে না। আমি কি পেয়াদা পাঠিয়ে পাঠিয়ে আপনাদের ডাকিয়ে আনছি ?"

কথাটা কতকটা যে সত্য তাহা স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই। অপ্রসন্ন মুখে রতনচাঁদ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিরূপাক্ষ বলিল, "আমারও ধিক ধ'রে গেছে হাজরা মশায়। আমি বলি, কেচ্ছা খতম করুন—একেবারে সব দিনের মতো।"

গভীরস্বরে রতনচাঁদ বলিল, "কেচ্ছা খতম হবে ব'লে মনে হয় না আমার।"

"ও কি কথা! নিশ্চয় হবে। আর দু-হাজার টাকা দিয়ে আপনি ওদের ওপর এক হাজার বেশী হ'য়ে নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরে যান।—আমিও মন খুলে আপনাদের সপক্ষে রিপোর্ট লিখতে আরম্ভ করি।"

রতনচাঁদের মুখে ক্রোধ ও ঘৃণার তামাটে হাসি দেখা দিল, বলিল, "এমন কথা ত' আপনি আরও বার দুই বলেছিলেন।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "তাই বিশ্বাস হচ্ছে না?—ভাল কথা, এবার না হয় রসিদ লিখিয়ে নিন। তা হ'লে ত' বিশ্বাস হবে?"

বিস্মিত হইয়া রতনচাঁদ বলিল, "রসিদ লিখিয়ে নোবো? কিসের রসিদ?"

অম্লান বদনে বিরূপাক্ষ বলিল, "ঘুষের মশায়, ঘুষের। আপনার সামনে ব'সে নিজের হাতে লিখে দেব, হাঁসপুকুরের মামলায় কাপাস-গাছার সপক্ষে রিপোর্ট লিখ্‌ব ব'লে আট হাজার টাকা ঘুষ নিলাম। তারপর পুরো নাম সই ক'রে তারিখ বসিয়ে দোবো।"

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া রতনচাঁদ বলিল, "এ আপনি করবেন?"

স্মিতমুখে বিরূপাক্ষ বলিল, "না করবার কারণ কি আছে শুনি? রসিদ লিখেও যদি আপনাদের কাজ নষ্ট করি তবেই না ভয়? আপনাদের কাজ ঠিক মতো ক'রে দিলেও কি শুধু আমার যাত্রাভঙ্গ করবার জন্যে আপনারা নিজেদের নাক কাটবেন?"

না কাটাই উচিত, কিন্তু সে কথা না বলিয়া রতনচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অগ্নির ঝলক অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইন্সপেক্টার বিরূপাক্ষ বলিতে লাগিল, "এত বড় সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র আপনাদের হাতে দিতে চাইছি সামান্য দু হাজার টাকার লোভে নয়, যাকে আপনি নিলাম বলছেন, একমাত্র সেই নোংরা ব্যাপারটার শেষ করবার জন্যে। যদি আপনাদের এ অস্ত্র প্রয়োগ করবার দরকার হয়, তা হ'লে আমার দশা কি হবে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? নাম যাবে, ইজ্জৎ যাবে, বাকি পাঁচ বছরের চাকরি যাবে, মোটা টাকার পেন্সন যাবে, তার ওপর হয় ত' শ্রীঘরে প্রবেশ ক'রে ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে জান যাবে। তা ছাড়া, আপনাদের আট হাজার টাকার বেনো জল মামলা মকদ্দমার খরচ বাবদে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার আসল জল বের করে' নিয়ে প্রস্থান করবে। বুঝুন ত' ব্যাপারখানা?"

বিরূপাক্ষের প্রস্তাবে রতনচাঁদ সম্মত হইল। আসন্ন মকদ্দমার ভিত্তি স্থাপন ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা রাখিতে সে প্রস্তুত নহে।

বিরূপাক্ষ বলিল, "টাকাটা সঙ্গে আছে? না, বাসা থেকে আনতে হবে?"

রতনচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, সঙ্গে নেই, আধ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসছি।"

"ভাল কথা। আমিও ততক্ষণে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্' আমার রিপোর্টের গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ ক'রে দিই।" বলিয়া বিরূপাক্ষ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রতনচাঁদ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বিরূপাক্ষ নিবিষ্টচিত্তে রিপোর্ট লিখিতেছে।

লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "এনেছেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।" বলিয়া রতনচাঁদ টাকা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গেঁজে খুলিতে উদ্যত হইল।

হাত দিয়া রতনচাঁদকে নিবারিত করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "টাকা পরে। আগে রসিদপত্র লেখা হ'য়ে যাক। কিসে লিখব? বাঙলায়, না ইংরিজিতে?"

রতনচাঁদ বলিল, "ইংরিজিতে।"

"পাকা লোক। আমি হ'লেও ইংরিজিতে লেখাতাম।"

"একটা নিবেদন আছে হুজুর।"

"কি বলুন?"

"রসিদে কাপাসগাছার উল্লেখ করবেন না।"

"তবে?"

"শুধু লিখবেন, হাঁসপুকুরের মামলায় ফরমাস মতো রিপোর্ট লেখার জন্যে আট হাজার টাকা ঘুষ নিলাম।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল রতনচাঁদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা উল্লসিত মুখে বিরূপাক্ষ বলিল, "উঃ। গভীর জলের মাছ। এমন চৌকোস কর্মচারী নইলে কি জমিদারির কাজ চলে? দরকার হ'লে এ রসিদের দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখী মারা চলবে।"

রতনচাঁদ মুখে কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল, মনে মনে বলিল, "দুই পাখীর একটি হচ্ছে ঘুঘু, অপরটি বাজ।"

রতনচাঁদের ফরমায়েস মতো রসিদ লিখিয়া বিরূপাক্ষ তাহার নিচে সুস্পষ্টভাবে দস্তখৎ করিয়া তারিখ বসাইয়া দিল। ততক্ষণে রতনচাঁদ দুই হাজার টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছে।

নোটের তাড়া দুইটা দেরাজের মধ্যে রাখিয়া রসিদখানা রতনচাঁদকে দিতে গিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "একটা কথা আছে হাজরা মশায়।"

"বলুন হুজুর।"

"যে বস্তু আপনাকে দিচ্ছি, তেমন বস্তু পরহস্তগত হ'য়ে থাকলে রাত্রে সুনিদ্রা হওয়া উচিত নয়। আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে, রিপোর্ট দেখার পরই এই সর্বনেশে কাগজখানা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।"

গভীর আবেগের সহিত রতনচাঁদ বলিল, "ধর্ম্ম-শপথ ক'রে বলছি, যেদিন রিপোর্ট জানতে পারবো সেই দিনই আপনাকে এ কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

রসিদখানা রতনচাঁদের হস্তে দিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "আর একটা কথা।"

কথা শেষ না হইয়া তাহার পৌনঃপুনিকতা দেখিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া রতনচাঁদ বলিল, "বলুন।"

"এবার বাসায় ফিরে গিয়ে নাকে খানিকটা সর্ষের তেল দিয়ে নিদ্রা যান।"

পাকা কাজ করিয়া রতনচাঁদের মেজাজ প্রসন্ন হইয়াছিল। একটু রসিকতা করিবার প্রলোভন সামলাইতে পারিল না, বলিল, "অভয় দেন ত' একটা কথা বলি।"

স্মিতমুখে বিরূপাক্ষ বলিল, "ভয় কি? কি বলবেন, বলুন না।"

রতনচাঁদ বলিল, "নাকে দেবার মত সর্ষের তেল আর নেই। যা ছিল সবই হুজুরের ঘরে খরচ হয়ে গেছে।"

অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়া বিরূপাক্ষ যুক্তকর তুলিয়া নমস্কার করিল।

রতনচাঁদ প্রস্থান করিবার ঘণ্টাখানেক পরে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "সেই বাবুটি এসেছে।"

ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "কে?"

"ঐ যে আর একজন আসে, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো নাক।"

বিরূপাক্ষ বলিল, "নিয়ে আয় এখানে।"

ক্ষণকাল পরে বনমালী মণ্ডল প্রবেশ করিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিল।

প্রত্যভিবাদন করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "বসুন।"

রতনচাঁদের পরিত্যক্ত চেয়ারে উপবেশন করিয়া বনমালী বলিল, "খবর কি স্যার ?"

মুখ ভার করিয়া লইয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "খবর গোলমেলে।"

"কেন ?"

"একটু আগে ওরা এসেছিল তা জানেন না ?"

"জানি।"

"তবে ? ওরা এসে গোল বাধিয়েছে মণ্ডল মশায়। আবও দু হাজার টাকা দিয়ে গেছে।"

রুদ্ধ রোষে এক মুহূর্ত চুপ কবিয়া থাকিয়া বনমালী বলিল, "তা হ'লে এই রকম কি চলতেই থাকবে ?"

বিরূপাক্ষ বলিল, "আপনি যদি দয়া ক'বে আপনাদের সাত হাজাব টাকা ফেরৎ নিয়ে যান তা হ'লে নিশ্চয়ই চলে না।" তাহাব পর চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

বনমালী বলিল, "চললেন কোথায় ?"

"টাকাটা নিয়ে আসি।"

দৃঢ়কণ্ঠে বনমালী বলিল, "টাকা পরে আনবেন। উপস্থিত আপনার মৎলবখানা কি খুলে বলুন ত ?"

পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "আমার মৎলব যতসম্ভব শীঘ্র রিপোর্ট লিখে দাখিল ক'রে দেওয়া।"

"ওদের সপক্ষে ?"

"হ'লেই বা একটু ওদের সপক্ষে, তাতেই কি ওরা বাজি মাৎ করবে ? অবিশ্যি, যে মাটির আমরা জোগান দিই, সাধারণত হাকিমরা সেই মাটিতেই পুতুল গড়েন। কিন্তু তাই ব'লে কি একমাত্র রিপোর্ট ছাড়া আর কিছুই বিবেচনা করবার থাকবেনা অত বড় মকর্দমায় ? সাত হাজার টাকায় আপনাদের মামলার উকিল খরচা হ'য়ে যাবে মণ্ডল মশায়। কি বলছেন আপনি ! টাকাটা নিয়ে যান।"

বনমালী বলিল, "টাকা নিতে আমি আসি নি। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে শেষ কথা কইতে,—আর সে শেষ কথা যে সত্যিই শেষ কথা, সে বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হ'তে।"

চিন্তিতমুখে বিরূপাক্ষ বলিল, "নাঃ, সঙ্কট বাড়ালেন দেখছি। কিসে আপনি নিশ্চিন্ত হন শুনি ?"

বনমালী বলিল, "আমি আপনাকে ন হাজার পুরিয়ে দেবো,—তার আগে এমন কিছু প্রমাণ আমাকে দিতে হবে, যাতে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি যে আপনি আর ও পক্ষকে আমল দেবেন না।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "তা' যদি বলেন তা হ'লে সংখ্যা একেবারে দশ হাজারে তুলে দিন। দশ হাজার কি ঠাট্টার কথা মণ্ডল মশায় ? একটা সম্পদ। কি বলেন আপনি। ন হাজারে যদিই বা একটা কান একটু খোলা থাকে, দশ হাজারে দুই কানে একেবারে তুলোই বলুন, আর তালাই বলুন।"

"কিন্তু তালার প্রমাণ কি দেবেন শুনি ?"

"প্রমাণ ? প্রমাণ রিপোর্ট। যতখানি লেখা হবে কাল এসে প'ড়ে দেখে যাবেন। যদি খুসি না হন, যদি টাকা ফেরৎ দেবার কথা তুলি, তাহ'লে যতবার ইচ্ছে আমাকে ছুঁচো ব'লে ডাকবেন। কেমন ? এবার হয়েছে ত ? আর মনে কোনো দ্বিধা রইল না ত ? এতেও যদি থাকে, তাহ'লে টাকা ফেরৎ নেওয়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর নেই।"

আপাততঃ মনে মনে বিরূপাক্ষকে বার দুই ছুঁচো বলিয়া সম্বোধন করিয়া বনমালী তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তৎপরে কাছারি-বাড়ি হইতে টাকা আনিয়া দশ হাজার পুরাইয়া দিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সেদিন আর কাজ না করিয়া আহারাদি সারিয়া বিরূপাক্ষ শুইয়া পড়িল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা-পান করিয়া সে হাঁসপুকুরের মামলার ফাইল লইয়া বসিল। এ পর্যন্ত সে রিপোর্টের উপক্রমণিকা ভাগ লইয়া এক পথ ধরিয়া সোজা খানিকটা

আসিয়াছে। এইবার পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দক্ষিণে বামে গিয়াছে। কলম ধরিবার পূর্বে বিরূপাক্ষর অন্তরে বুদ্ধি এবং বিবেকের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী বাক্-বিতণ্ডা হইয়া গেল। বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার দক্ষিণ দিকের পথে কাদের নিয়ে যাবে?' ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিবেক বলিল, 'কেন, বকুলডাঙ্গাদের।' বুদ্ধি বলিল, 'আর, কাপাসগাছাদের রসিদ লিখে দিয়েছ যে? তাদের প্রতি বাম হ'লে চলবে কেন?' বিবেক বলিল 'খাসা কথা। দু'হাজার টাকা যারা বেশি দিলে তাদের প্রতি বাম হ'লে চ'লবে? রসিদ লিখে দিয়েছি ব'লে ত' আর ধর্মচ্যুত হ'তে পারি নে।' 'তবে, ধর্মেই কায়েম থাক।' বলিয়া বুদ্ধি অন্তরের অন্দরমহলে গিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিল।

দিন তিনেক নিরবসর পরিশ্রম করিয়া বিরূপাক্ষ রিপোর্ট শেষ করিয়া দাখিল করিল। রিপোর্টে সে বকুলডাঙ্গাদের যতটা তীরে তুলিয়াছে, কাপাসগাছাদের ঠিক ততটাই জলে ডুবাইয়াছে।

রিপোর্ট দেখিয়া কাপাসগাছার মধ্যম কর্তা আগুন হইয়া উঠিল। "জেলে যাই একা যাব না, ও হারামজাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর ভিটে-মাটি চাটি ক'রে ছাড়ব।"

ভাল করিয়া রসিদখানার ফটোগ্রাফ রাখিয়া রতনচাঁদ রেজিষ্টার্ড পোষ্টে আসলখানা বেনামি করিয়া কলিকাতায় ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পোলিসের নামে পাঠাইয়া দিল।

তৎকালীন ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ছিল টম্‌সন্ নামে একজন দুর্দান্ত ইংরাজ। দৈর্ঘ্যে সে ছিল ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, এবং ওজনে তিন মনের কম নহে। মুখখানা তাহার ছিল ভীমরুলের চাকের মতোই গোল এবং ভয়াবহ।

দেহের দিকে বিধাতাপুরুষ টম্‌সনের প্রতি কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই; করিয়াছিলেন বুদ্ধির দিকে। তবে বুদ্ধিমান সে যে নহে, এ কথা

উপলব্ধি করিবার দুর্লভ বুদ্ধিটুকু তাহার ছিল। সে জানিত তাহার ভার আছে, কিন্তু ধার নাই।

খামের উপর confidential লিখিত ছিল বলিয়া চিঠিখানা বন্ধ অবস্থায় টম্‌সনের কাছে আসিয়াছিল। খাম খুলিয়া ভিতরকার কাগজের মর্ম অবগত হইয়া টমসনের দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিরূপাক্ষ একজন নামজাদা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাহার লিখিত চিঠিপত্র রিপোর্ট ইত্যাদি সর্বদাই ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের অফিসে আসিয়া থাকে। বিরূপাক্ষর হস্তাক্ষর এবং স্বাক্ষরের সহিত তাহার পরিচয় নিতান্ত অল্প নহে। টম্‌সন্ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সম্প্রতি বিরূপাক্ষর হস্তলিখিত একটা দীর্ঘ চিঠি আসিয়াছে। হেড ক্লার্কের দ্বারা উক্ত চিঠিখানা আনাইয়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে উভয় লেখা নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া টম্‌সনের মনে সন্দেহ রহিল না যে, আট হাজার টাকা ঘুষের রসিদ সত্যসত্যই বিরূপাক্ষর নিজের হাতের লেখা।

একটা সাধারণ ইন্‌স্পেক্সন করিবার অজুহাতে দিন দুই তিনের মধ্যে টম্‌সন্ আসিয়া উপস্থিত হইল একেবারে অকুস্থলে। অবিলম্বে সারকিট হাউসে ডাক পড়িল ইন্সপেক্টর মজুমদারের।

বেলা তখন সাড়ে তিনটা। বৈকালিক চা-পান শেষ করিয়া একটা ফাইলে টম্‌সন্ কি লিখিতেছিল, বিরূপাক্ষ উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরের সব কুশল ত?"

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া অপ্রসন্ন নেত্রে বিরূপাক্ষর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া টম্‌সন্ তাহাকে বসিবার ইঙ্গিত করিল। সম্মুখস্থ চেয়ারে বিরূপাক্ষ উপবেশন করিলে গভীর কণ্ঠে বলিল, "তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে মজুমদার।"

আকাশ হইতে পড়িল বিরূপাক্ষ। হাসি-হাসি প্রফুল্ল মুখ মুহূর্তে গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিল, "আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ?

কই, সম্প্রতি আমি ত' এমন কোনো ভুল-ভ্রান্তি করেছি ব'লে মনে পড়ে না।"

সাধু সাজিবার ভণ্ডামি দেখিয়া টম্‌সন্ জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি আট হাজাব টাকা ঘুষ নিয়েছ।"

বিরূপাক্ষর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না! মুহূর্তকাল বিহ্বলভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আট হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছি? কে বললে আপনাকে?"

"তুমি নিজেই বলেছ স্যার!" বলিয়া খাম হইতে রসিদখানা বাহিব করিয়া বিরূপাক্ষর হাতে দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "এ রসিদ যে তোমার নিজের হাতের লেখা, তোমাব নিজের দস্তখত করা, সে কথা অস্বীকার করবার ধৃষ্টতা রাখ নাকি?" তাহার পর বিরূপাক্ষর মুখমণ্ডলে অপরাধ-লিপির ভাষ্য পাঠ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ নেত্রে তাহাব দিকে চাহিয়া রহিল।

রসিদখানা পড়িতে পড়িতে কিন্তু বিরূপাক্ষর মুখে চাপা কৌতুকেব মৃদু হাস্য উত্তরোত্তর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। গভীর কৌতূহল ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ কবিয়া উল্টাইয়া অপর দিকটা একবার দেখিয়া লইয়া রসিদখানা টম্‌সনের হাতে ফিরাইয়া দিয়া মুহূর্তকাল সে চুপ করিয়া রহিল। ইত্যবসরে তাহার মুখ হইতে কৌতুক হাস্যের শেষ আমেজটুকুও বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর গম্ভীর মুখে গভীর স্বরে বলিল, "আচ্ছা, স্যার, আপনার অফিসে টেবিলের পাশে কি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট ছিল না?"

এ প্রশ্নের যথার্থ তাৎপর্য টমসনের দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইল; বিশেষত বর্তমান প্রসঙ্গের সহিত ইহার যোগ কোথায়, তাহা সে একেবারেই খুঁজিয়া পাইল না। অগত্যা তাহাকে বলিতেই হইল, "তার মানে?"

বিরূপাক্ষ বলিল, "তার মানে, তা হ'লে অত্যন্ত বাজে আর রোথো ঐ জাল কাগজখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে সেই বাস্কেটে ফেলে দিতে পারতেন।"

বিরূপাক্ষর কথা শুনিয়া টম্‌সন্ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "জাল বলতে চাও তুমি এই রসিদ।"

অবিচলিত কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলিল, "তা নয়ত কি আসল বলব স্যার? পুলিশে যখন কাজ করি, তখন তর্কের খাতিরে ধরাই যাক ঘুষ নিয়েছি; কিন্তু তাই ব'লে রসিদ দোবো? ঘুষের রসিদের কোনো মানে হয় স্যার? সামান্য আট হাজার টাকার জন্যে লিখিত-পড়িত ক'রে অকারণ নিজেকে এমন বিপন্ন করব যাতে মান-ইজ্জৎ যাবে, চাকরি-পেন্সন যাবে, টাকা ত' ওগরাতে হবেই, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে ঘানি ঘোরাতেও হবে? আমি কি পাগল স্যার? আমি কি শিশু?"

এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদের উত্তরে কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বিরূপাক্ষর সম্মুখে একটা সাদা কাগজ স্থাপিত করিয়া টম্‌সন বলিল, "একটা সই কর ত' এতে,—যেমন তুমি সচরাচর ক'রে থাক, ঠিক তেমনি।"

মুহূর্ত মাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া ফস্ করিয়া সই করিয়া বিরূপাক্ষ কাগজখানা টম্‌সনের হাতে ফিরাইয়া দিল।

ক্ষণকাল উভয় দস্তখত অভিনিবেশ সহকারে মিলাইয়া দেখিয়া টম্‌সন্ বলিল, "কিন্তু দেখ মজুমদার, দুই দস্তখত হুবহু এক।"

স্মিতমুখে বিরূপাক্ষ বলিল, "তাই যদি না হবে তা হ'লে এতদিন ধ'রে জাল করার ব্যবসা চলবে কেন বলুন? আপনি জানেন কি-না বলতে পারিনে স্যার, আমাদের এই জেলা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে হাতের লেখা জাল করার কারবারে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণে কেপ কমোরিন, পশ্চিমে পেশাবার, আর পূর্বে রেঙ্গুন থেকে এখানে লোক এসে জাল করিয়ে নিয়ে যায়। ফল পায়, তবে ত' আসে।"

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া টম্‌সন বলিল, "কিন্তু এমন ভাবে তোমার লেখা জাল ক'রে আমাকে পাঠাবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা বল ?"

অল্প হাসিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "এ ত' অনুমানের কথা স্যার। আপনার চেয়ে কি আমি বেশি বুদ্ধি ধরি যে, বেশি অনুমান করতে পারব? আপনার পূর্ববর্তী আই-জি মিস্টার ম্যাকফাস´ন যদি এ প্রশ্ন করতেন আমি বিস্মিত হতাম না , কিন্তু আপনার মতো একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার, অত্যন্ত কুট-কচালে আর গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে অভ্রান্ত দৃষ্টি চালিত করবার যাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে, তিনি কেন আমাকে এ প্রশ্ন করলেন, তাই ভাবছি। তবু যদি একান্তই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমাকে তা হ'লে বলব, যে পক্ষ আমার রিপোর্টে খুসি হ'তে পারেনি, এ তাদেরই চাল। টাকা নিয়ে যদি রসিদ দিয়ে থাকি, তা হ'লে অন্ততঃ নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে তাদের কাজ ক'রে ত দিয়েছি ?—তার পরও তারা রসিদ পাঠিয়ে নিজেদের কাজ পণ্ড করবে, আর আমাকে বিপদে ফেলবে, যার মাথায় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

বিরূপাক্ষর এই সুদীর্ঘ বাক্যের মধ্যে একযোগে দুইটি ঔষধের প্রয়োগ ছিল,—প্রথমতঃ পূর্ববর্তী আই-জির বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি পরোক্ষ নিন্দা,—এবং দ্বিতীয়তঃ টম্‌সনের উক্ত বৃত্তির বিষয়ে উচ্ছল প্রশংসা। অবসর গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে ম্যাক্‌ফাস´ন সার্ভিস বুকে টমসনের বিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছিল, তাহা যে টম্‌সনকে খুসি করিবার মতো নহে, তাহা বিরূপাক্ষর অবিদিত ছিল না। সুতরাং ম্যাক্‌ফাস´নের নিন্দায় টম্‌সন খুসি না হইয়া পারে না। তদুপরি, তাহার প্রতি প্রযুক্ত বিরূপাক্ষর অপরিমিত প্রশংসাও তাহাকে খানিকটা খুসি করিয়াছিল। হয়ত' সে-প্রশংসাকে টম্‌সন্ কতকটা তোষামোদ বলিয়া মনে মনে সন্দেহও করিয়াছিল, কিন্তু তোষামোদের একটা বিশেষ গুণ আছে যে,

বুঝিতে পারিলেও কপট প্রশংসার দ্বারা অধিকাংশ মানুষই তুষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন তৃতীয় মহৌষধ ছিল বিরূপাক্ষর বাক্যের শেষাংশে,—"যার মাথায় বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, সে এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।" ইহার পর যদি টম্‌সন বিশ্বাস করার দিকে এক পাও অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ত' বিরূপাক্ষ-কথিত 'অভ্রান্ত দৃষ্টি চালিত করিবার বিস্ময়কর ক্ষমতাকে' সীসা হইয়া সাগরগর্ভে গিয়া আশ্রয় লইতে হয়।

সেই অভ্রান্ত দৃষ্টিশক্তিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে টম্‌সন বলিল, "আমারও এক-একবার মনে হচ্ছিল যে-পক্ষ তোমার রিপোর্টে খুসি হ'তে পারেনি, এ তাদেরই কৌশল। রসিদ নেওয়া আর রসিদ পাঠানো পরস্পর-বিরোধী দুই ব্যাপার,—এক সঙ্গে এরা দাঁড়াতে পারে না।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "ঠিক বলেছেন স্যার, ঠিক বলেছেন—পরস্পর-বিরোধী দুই ব্যাপার, যা একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে না। চমৎকার যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত।"

তাহার পর গদগদ কণ্ঠে বলিল, "এমন কথা যদি প্রথমেই আপনার মনে উদয় হ'য়েছিল, তাহ'লে বেল-ষ্টীমারের এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে কেন এখানে এলেন স্যার ?"

নিঃশব্দে মৃদু হাসিয়া টম্‌সন্ বলিল, "শুধু এই জন্যেই আসিনি মজুমদার, এখানকার administration ব্যাপারটা আর একটু improve করা যায় কি-না, সে বিষয়ে একটু দেখে-শুনে যাব।"

"একটা কথা বলব স্যার ?"

"কি ?"

"যদি আপনার মনে এ বিষয়ে কিছু কৌতূহল এখনো থাকে, তাহ'লে একটা কাজ করি।"

"কি কাজ ?'

"আপনার হাতের লেখা একটু দিন যাতে ইংরেজি বর্ণমালার সব অক্ষরগুলো থাকে। আর আপনার স্পেসিমেন সিগনেচার একটা দিন। আমি পরশু বিকেলের মধ্যে আপনাকে একটা চিঠি দেবো। চিঠিখানা দেখে অবাক হ'য়ে আপনি বলবেন, এ চিঠি তোমাকে আমি নিশ্চয় কোনো দিন লিখেছিলাম, কিন্তু লিখেছিলাম তা আদৌ মনে পড়ছে না।"

চক্ষের ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বদিকে অনেকখানি টানিয়া তুলিয়া টম্‌সন্ বলিল, "বল কি মজুমদার!"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। আর এই নিখুঁৎ কাজের বেতন কত জানেন? দস্তখত জাল করার জন্যে পাঁচ টাকা,—আর মায় দস্তখত একটা মাঝারি সাইজের চিঠির জন্যে পনের টাকা।"

"মাত্র?"

"মাত্র।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বিরূপাক্ষ বলিল, "পরীক্ষাটা করবেন স্যার? কৌতূহল চরিতার্থ হ'ত।"

মাথা নাড়িয়া টম্‌সন্ বলিল, "দরকার নেই। পরশু পর্যন্ত আমি থাকচিনে, কাল বৈকেলেই কলকাতা রওনা হব। তুমি এখন আসতে পার মজুমদার। তোমাকে অনর্থক একটু কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করো না। আচ্ছা, গুডবাই।" চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বিরূপাক্ষ বলিল, "গুডবাই স্যার।" তাহার পর অধিকন্তু একটা দীর্ঘ সেলাম ঝাড়িয়া কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

সার্কিট হাউসের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের উপর পড়িয়া বিরূপাক্ষ খানিকটা আগাইয়া গেল, তাহার পর পিছন ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া রামপ্রসাদী সুরে গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিল,

মন হারালি কাজের গোড়া!
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি'
কোথায় পাবে টাকার তোড়া!

জনকোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া দেখি লক্ষ্ণৌ স্টেশনে পেঁীছিয়াছি। সময় তখন অপরাহ্ণ।

বেনারস হইতে লক্ষ্ণৌয়ের দূরত্ব দুইশত মাইলও নহে। কিন্তু আমাদের নিদ্রিত অবস্থার সুযোগে এই সামান্য দূরত্বের মধ্যেই সে-হিসাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন অনেক অধিক পরিমাণে ঘটিয়া গিয়াছে। রাজার রাজ্য ছাড়িয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছি নবাবের রাজ্যে, সে কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চন্দন-চুয়ার স্থান গ্রহণ করিয়াছে আতর-গুলাব, প্ল্যাটফর্মে চলমান জনতা এবং উঠা-নামা-রত মুসাফিরদের মুখে মুখে হিন্দী ভাষা কমিয়া গিয়া চোস্ত উর্দু মুখর হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি, ফেরিওয়ালাদেরও শরীরের আয়তনের ও কণ্ঠের স্বরের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে;—'ডাল-রোটি'র পরিবর্তে এখন তাহারা গভীর কণ্ঠে হাঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'গোস্ত-রোটি' অথবা 'রোটি-কবাব'।

কথিত আছে, দশরথ-তনয় লক্ষ্মণ এই স্থলে লক্ষ্মণপুর নামে এক জনপদ স্থাপিত করেন, যাহা কালক্রমে লক্ষ্ণৌ নাম ধারণ করে। পরে অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশীয় নবাবগণের উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ্ণৌ এক মহানগরীতে পরিণত হয়। প্রত্যেক নবাবই নিজ নিজ প্রয়োজন, ইচ্ছা এবং খেয়াল অনুসারে প্রাসাদ, উদ্যান এবং অপরাপর হর্ম্যাদি রচিত করিয়া লক্ষ্ণৌর গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইহার পরাকাষ্ঠা করেন পঞ্চম, অর্থাৎ, শেষ নবাব রাজা ওয়াজিদ আলি শাহ্ আশী লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিরাট প্রাসাদ কৈসর বাগ নির্মিত করিয়া।

নবাবি বলিতে আমরা যে বিলাস-সৌখিনতা-ইন্দ্রিয়পরতা, যে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের কথা বুঝি, তাহাতে লক্ষ্ণৌ বোধ করি দিল্লী-আগ্রাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। নবাবি কথাটাই এ কথার একটা প্রমাণ। কাহাকেও অসঙ্গতভাবে বাবুগিরি করিতে দেখিলে আমরা

বলি 'নবাবি করা হচ্ছে', 'বাদশাহি করা হচ্ছে' বলি না। বাদশাহেরা প্রধানত রাজ্যশাসন করিতেন, নবাবেরা করিতেন নবাবি। শুনা যায় লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শার তিন শত ষাটটি উপপত্নী ছিল, এবং প্রত্যেক উপপত্নীর জন্য ছিল স্বতন্ত্র মহলের ব্যবস্থা। আর চারটি উপপত্নী বাড়াইয়া প্রতিদিন একটি হিসাবে নবাব বাহাদুর তিন শত চৌষট্টি সংখ্যা কেন পূরণ করেন নাই তাহা বলা কঠিন, সম্ভবতঃ পূরণ করিবার সময় পাইবার পূর্বেই তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতার মেটিয়াবুরুজের মুচিখোলায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই অরসিকোচিত আচরণের জন্য লর্ড ডালহৌসি ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছেন। শাসনবিশৃঙ্খলার অজুহাতে তিনি নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে পত্র লিখিয়া হুঁসিয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি নবাব নিজেকে সংশোধিত করিতে ও রাজ্য সুশাসনে আনিতে না পারেন, তাহা হইলে অযোধ্যা রাজ্য ভারতসাম্রাজ্যে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, এই সতর্কীকরণে কোন ফল না হওয়ায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হুকুম অনুযায়ী অযোধ্যাকে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে নৈতিক বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিয়া রাখা হয়।

দুঃখও হয় এই হতভাগ্য ওয়াজিদ আলি শাহদের কথা ভাবিয়া। লক্ষ্ণৌর কৈসর বাগ হইতে কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজের মুচিখোলায় পতন বোধ করি কৈসর বাগের একজন দীনতম পরিচারকের পক্ষেও দুঃসহ! ভাগ্য ওয়াজিদ আলিকে বিপুল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্মতি তাঁহাকে তথায় তিষ্ঠিতে দিল না। মানুষ যখন নিজের সর্বনাশ নিজে করিতে যত্নবান হয়, তখন সে-বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহই তাহার সহিত পারিয়া উঠেনা। অপরে যে ক্ষতি করে, তাহার একটা সীমা থাকে, কিন্তু মানুষ নিজে নিজের যতটা

ক্ষাত করিতে পারে, বোধ করি তাহার সীমা-পরিসীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিন শত ষাট উপপত্নী যে ভোগের বস্তু নহে, পরন্তু মহা দুর্ভোগের হেতু, তাহা ওয়াজিদ আলি নিজের জীবনের মধ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া যাইবার সময়ে গভীর মনস্তাপের ভিতর দিয়া বোধ হয় সে দুর্ভোগের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী, কহো হাল আদম পর্ কেয়া গুজারি" গানখানি সেই করুণ কাহিনীর সুবেলা সাক্ষ্য।

'বাবুগিরি' নবাবির সগোত্র বস্তু, তবে নিতান্তই দরিদ্র সগোত্র, একেবারে হোমিওপ্যাথিক ডোজের আস্বাদ। পূর্বকালে বাঙলা দেশ নবাবের দেশ ছিল, সুতরাং তথাকার জমিদার এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে নবাবির কণিকা সংস্করণ 'বাবুগিরি' নবাবির সমস্ত আধি-ব্যাধি লইয়াই সংক্রামিত হইয়াছিল। উপপত্নীপোষণের ব্যাধিও আসিয়াছিল, তবে তিন শত ষাটের মাত্রায় নহে, এক অথবা দুইয়ের মাত্রায়। এই উপপত্নীরক্ষণের বিষয়ে বাবু-ব্যক্তিরা ঢাকঢোল-কাঁসরঘণ্টাদের বড় একটা ধার ধারিতেন না। এমন কি, সেকালের দিনে ইহা আভিজাত্যের অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত, শুধু পারিষদজনসাধারণের মধ্যেই নহে,—বাবুদের ধর্মপত্নীগণেরও মধ্যে। ধর্মপত্নীগণের মধ্যে এই ব্যাপার এমন সহজ হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা এই প্রথাকে পৌরুষের একটা ধর্ম এবং বড় ঘরের ঘরণী হইবার ন্যায়সঙ্গত মাশুল বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, দুইজন মহিলার মধ্যে বচসাকালে ঝগড়া-বিবাদে এমন কথাও বলিতে শুনা যাইত যে, "তোমার স্বামীর মাসিক যা আয়, প্রতিমাসে তার দ্বিগুণ ব্যয় হয় আমার স্বামীর রক্ষিতার পিছনে,—তুমি আস আমার সঙ্গে কথা কইতে কোন্ মুখে?" বলিতে পারিনা, এমন হীনতাদায়ক ভর্ৎসনার দাপটে দ্বিতীয় মহিলাটি লজ্জায় মুখ নত করিতেন কি-না।

পিয়াদার মর্যাদা যেমন পাগড়ির মধ্যে জমা হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ জমা হইয়া থাকিত বাবুদের মর্যাদা তাঁহাদের রক্ষিতাদের মধ্যে। সংঘর্ষ বাধিলে অনেক সময়ে রক্ষিতাদের মান-অপমান হইত বাবুদের জয়-পরাজয়ের কষ্টিপাথর। এই সম্পর্কে বৎসর পঞ্চাশেক পূর্বের একটি কৌতূকাবহ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে কথাটা সুপরিস্ফুট হইবে।

কলিকাতার এক রাজপথের উপর একটি কম্পাউণ্ডযুক্ত বৃহৎ অট্টালিকায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূগণসহ সপরিবারে বাস করিতেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি, উল্লেখের সুবিধার্থে যাঁহার নাম দেওয়া গেল সুরেশপ্রসাদ। বিদ্যাবুদ্ধি-অর্থ-পেশা-চরিত্রগুণে এই সুরেশপ্রসাদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত নাগরিক। তাঁহার গৃহের ঠিক সম্মুখে পথের অপর দিকে একটি নাতিক্ষুদ্র দ্বিতলগৃহে দাসদাসী লইয়া বাস করিত সকন্যা একটি স্ত্রীলোক। এই স্ত্রীলোকটি ঠিক সমাজ-স্বীকৃত রমণী ছিলনা। সে ছিল একজন খ্যাতনামা জমিদারের উপপত্নী। এই জমিদারবাবুটি, যাঁর নাম দেওয়া গেল অভয়শঙ্কর, শিক্ষা সম্মান পেশা প্রভৃতিতে সুরেশপ্রসাদের অপেক্ষা কম ত ছিলেনই না, অধিকন্তু অর্থে ও বিষয়-সম্পত্তিতে ছিলেন অনেক উচ্চে।

সমাজের অন্তর্গত না হইলেও, এই রমণী ঠিক ভদ্র পরিবারের মতই বাস করিত। এবং তাহাদের লইয়া পল্লীতে কোনো অশান্তি ছিলনা। ক্বচিৎ-কখনো মেয়েটিকে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইতে দেখা যাইত, ঠিক ভদ্রঘরের মেয়েদেরই মতো অল্পক্ষণের জন্য পথের জন-চলাচল দেখিবার কৌতূহলে। তাহার মাতাকে দেখা যাইত আরও কম, কখনো বস্ত্রাদি মেলিতে, কখনো বা তুলিতে। বাহিরের লোকের পক্ষে এই দুইটি নারী ভদ্রবংশের মেয়ের চাইতে কম দুর্দর্শ ছিলনা।

কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ছিল। যেদিন কোন বিশেষ যোগ-যাগ অথবা পুজা-পার্বণ থাকিত, সেদিন এই দুই মাতা ও কন্যা গঙ্গাস্নানে যাইত এবং বোধকরি অধিক পুণ্যের প্রত্যাশায় পদব্রজে যাইত। মাতা যৌবনের শেষ সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে, কন্যা কৈশোরের শেষ সীমান্তে। যৌবন সমীপবর্তী হইয়া সবে মাত্র তাহাকে সাদর আহ্বান

জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উভয়েই অপরূপ সুন্দরী। যেদিন ইহারা পথে বাহির হইত, সেদিন যুবকেরা বারংবার হোঁচট খাইত, এবং বৃদ্ধেরা যে স্পৃহনীয় তারুণ্য বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিত।

এ ব্যাপারটা কিন্তু সুরেশপ্রসাদ পছন্দ করিতেন না, প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, তাঁহার গৃহের ঠিক সম্মুখে দুইটি অশুচি গোত্রের স্ত্রীলোক বাস করে, ইহা তাঁহার নৈতিক রুচিতে বাধিত; এবং দ্বিতীয়ত, এমন প্রখর শাণিত দুইখানি ছুরিকা, বিশেষত তরুণী ছুরিকাটি, এত নিকটে অবস্থান করিলে যে-কোনো সময়ে নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া তিনি ভয় পাইতেন।

এবিষয়ে কি প্রতিকার করা যাইতে পারে ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে সুরেশপ্রসাদ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। প্রমথ নামে তাঁহার এক কর্মচারী ছিল, তাহাকে মংলবটা খুলিয়া বলিলেন। প্রমথর বুদ্ধি এবং চতুরতার প্রতি সুরেশপ্রসাদের আস্থা ছিল. তিনি জানিতেন, যেখানে যে-কাজটি করিতে হয়, অথবা যে-কথাটি বলিতে হয়, তাহা করিতে এবং বলিতে প্রমথর প্রায়ই ভুল হয় না।

প্রভুর কথা শুনিয়া প্রমথ বলিল, "এ কাজ ত' সহজেই হ'তে পারবে, কিন্তু দু হাজার কেন? পাঁচ শ'ই যথেষ্ট।"

মাথা নাড়িয়া সুরেশপ্রসাদ বলিলেন, "না হে প্রমথ, সব সময়ে effective dose প্রয়োগ করতে হয়। আণ্ডার ডোজে কাজ হয় না।"

আর কোনো কথা না বলিয়া প্রমথ পরদিন সকাল আটটার সময়ে সামনের বাড়িতে গিয়া কড়া নাড়িল। একজন ঝি দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চান?"

প্রমথ বলিল, "এ বাড়ীর গিন্নীকে।"

"কোথা থেকে আসছেন?"

"সামনের সুরেশপ্রসাদ বাবুর বাড়ী থেকে।"

আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া প্রমথকে একটা ঘরে বসাইয়া ঝি উপরে গিয়া সংবাদ দিল।

Effective dose-এর প্রয়োগে কিরূপ অবলীলার সহিত রোগিণী একেবারে কাত হইয়া পড়িবে, সেই কথা ভাবিয়া প্রমথ মনে মনে উৎফুল্ল হইতেছিল, এমন সময়ে গৃহিণী সরমাবালা ঘরে প্রবেশ করিয়া যুক্তকরে প্রমথর প্রতি নমস্কার জানাইল।

প্রমথ একটু বিপদে পড়িল। একজন অবনতচরিত্র স্ত্রীলোকের নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করিলে নিজের কৌলীন্যকে খর্ব করা হইবে কি-না তদ্বিষয়ে মনে একটা খটকা বাধিল, অথচ সৌন্দর্যের এমন-এক প্রদীপ্ত মহিমার সামনা-সামনি হইয়া পরোক্ষভাবেও রূঢ়তা প্রকাশ করিতে কোথায় যেন কেমন একটা কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। দুই হাত অল্প একটু তুলিতে গিয়া সহসা নামাইয়া লইল, আসন ছাড়িয়া উঠিবার ঈষৎ উপক্রম করিয়াই বসিয়া পড়িল। স্পষ্টভাবে সৌজন্য প্রকাশ করিতে পারিল না, অথচ নিরেট হইয়া থাকাও কঠিন হইল।

সরমা কহিল, "আপনি সুরেশবাবুর বাড়ি থেকে আসছেন?"

প্রথম বলিল, "হ্যাঁ।"

"কি প্রয়োজন বলুন ত?"

তুমি বলিয়া সরমাকে সম্বোধন করিতেও প্রমথর মুখে বাধিল, কহিল, "বাবু আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।" বিনা ভূমিকায় কথাটা নিতান্ত সাদা-সিধা শুনিতে হইল মনে করিয়া পরমুহূর্তে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "প্রস্তাবটা কিন্তু আপনার পক্ষে খুবই লাভজনক।"

সরমা কহিল, "লাভ-লোকসানের কথা পরে বুঝব; প্রস্তাবটা কি, আগে বলুন।"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রমথ বলিল, "বাবু আপনার বাড়িটা খরিদ করতে চান। কিন্তু কি সর্তে জানেন? বাজার দর অনুযায়ী যে ন্যায্য দাম আপনি ঠিক করবেন, তাই তিনি মেনে নেবেন; অধিকন্তু দু হাজার টাকা আপনাকে বেশি দেবেন।"

"দাম আমি ঠিক করব, আর তার ওপর তিনি দু হাজার টাকা বেশি দেবেন?" সরমার কণ্ঠস্বরে একটু যেন বিস্ময়ের আমেজ।

ঔষধ ধরিয়াছে মনে করিয়া উৎফুল্ল মুখে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া প্রমথ বলিল, "হ্যাঁ, দেবেন।"

সরমা বলিল, "দেখুন, এ বাড়ি কিনে পর্যন্ত আমি সতের আঠার বৎসর এ পাড়ায় বাস করছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনও সুরেশ-বাবু আমার প্রতি ছিটে-ফোঁটা অনুগ্রহও করেন নি। আজ হঠাৎ তিনি আমার ওপর এতখানি সদয় হ'য়ে উঠলেন কেন বলুন ত?"

মুরুব্বিয়ানার একটু চাপা হাসি হাসিয়া প্রমথ বলিল, "সে কথা আপনি নাই শুনলেন?"

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া সরমা কহিল, "আপনি না বললেও সেকথা আমি বুঝেছি। আপনার বাবু পছন্দ করেন না যে, আমার মতো অসামাজিক স্ত্রীলোক তাঁর বাড়ির সামনে বাস করে। কেমন, এই কারণ না?"

মুখের উপর একটা অর্থভরা হাসি ফুটাইয়া নিঃশব্দ ভাষায় প্রমথ জানাইল, সেই কারণই বটে।

সরমা বলিল, "আচ্ছা, কাল আপনি ঠিক এই সময়েই আসবেন, আপনাকে আমার মতামত জানাব।" বলিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর যথানিয়ম অভয়শঙ্কর আসিলে সরমা তাঁহাকে সুরেশ-প্রসাদ ও প্রমথর কথা জ্ঞাপন করিল। ধৈর্য সহকারে সকল কথা

শুনিয়া মৃদু হাসিয়া অভয়শঙ্কর বলিলেন, "সুরেশটা চিরকাল কেমন ব্যাদড়াই রয়ে গেল। ও আর শুধরোলো না।" তাহার পর যেকথা প্রমথকে পরদিন বলিতে হইবে তাহা সরমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

পরদিন যথাসময়ে সামনের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া প্রমথ কড়া নাড়িল। পূর্বদিনের পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া প্রমথকে দেখিয়া আজ যেন একটু সুস্পষ্ট অভ্যর্থনার সহিত তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল। প্রমথ আসিবে, সে কথা সে হয়ত তাহার কর্ত্রীর নিকট শুনিয়াছিল। সমাদর অনুমান করিয়া প্রমথ বুঝিল সুরাহা।

ক্ষণকাল পরে সরমা কক্ষে প্রবেশ করিলে আজ প্রমথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে যুক্ত করে অভিবাদন করিল। প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সহৃদয় লোকের পক্ষে মহানুভবতাকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিনই হয়।

প্রত্যভিবাদন করিয়া সরমা বলিল, "বসুন, বসুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ? সব ঠিক ত ?"

সরমা বলিল, "হ্যাঁ, সবই ঠিক, তবে একটু অন্য রকমে।"

প্রমথ মনে করিল অন্য রকম আর অপর কিছুই নহে, দুই হাজারের উপর আর কিছু চাপ দিবার মৎলব। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল, "অন্য রকম,—কি রকম বলুন ত ?"

সরমা বলিল, "দেখুন, আমিও পছন্দ করিনে যে, সুরেশবাবুর মতো একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত সঙ্কীর্ণচেতা মানুষ আমার বাড়ির সামনে বাস করেন। তাই আমার প্রস্তাব, সুরেশবাবু তাঁর বাড়ির যে-মূল্য ঠিক করবেন, আমি তার দেড়া দামে তা কিনে নোব। তিনি অন্য জায়গায় উঠে গিয়ে দেখেশুনে বেছে-বুছে বাড়ি-ঘর-দোর তৈরি করুন।"

একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের মুখে সাত হাত লম্বা কথা শুনিয়া প্রমথর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল! ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে সে বলিল,

সুরেশবাবুর বাড়ি ত কিনবেন, কিন্তু সুরেশবাবুর বাড়ির দাম কত হবে তার আন্দাজ আছে ত ?”

কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া সরমা বলিল, “ধরুন, লাখ টাকা।”

প্রমথর আন্দাজ কিন্তু আশী-পঁচাশী হাজার টাকার অধিক নহে ; বলিল, “তারপর ?”

“তারপর আমি দেবো দেড় লাখ।”

“পারবেন দিতে ?”

“না পারি, আমার বাড়ির যে-মূল্য সুরেশবাবু স্থির করবেন, সেই মূল্যে তাঁকে বাড়ি বিক্রয় ক'রে উঠে যাব। দয়া-দাক্ষিণ্যের দু হাজার টাকা তাঁকে দিতে হবে না।”

মনে মনে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া প্রমথ বলিল, “দু হাজারের ওপর আমরা যদি আরও কিছু বাড়ি ?”

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া সরমা বলিল, “আমার প্রস্তাব সুরেশবাবুকে জানিয়ে বলবেন, তিনি যদি রাজি হন, এক সপ্তাহের মধ্যে দলিল দস্তাবেজ টাকা-কড়ির লেন-দেন সব শেষ হ'তে পারবে।”

তাহার পর প্রমথকে আর কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রস্থান করিল।

প্রমথর মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া সুরেশপ্রসাদের মুখ আরক্ত এবং ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিলেন সরমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া রাসকেল অভয়শঙ্করটাকে বেশ একটা আর্থিক আঘাত দেন ; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল অভয়শঙ্করকে আঘাত দিতে গিয়া ঐ নীচ স্ত্রীলোকটার নিকট এত বড় পরাজয় স্বীকার করিতে হইলে আর কলিকাতার ভিতর বাড়ি করিয়া বাস করা চলিবে না। অগত্যা সেই অপমানকে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় রহিল না।

ইতিমধ্যে গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিপণি এবং বিবিধ পণ্য-সম্ভারে খচিত বিচিত্র প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া আমরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

গাড়ি আপ্ ডিস্ট্যান্ট্ সিগনাল ছাড়াইলে আমাদের ডাক পড়িল টেবিলে। চা পান করিতে বসিলে আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে ললিতবাবু বলিলেন, "বেনারেস থেকে লক্ষ্ণৌ এই চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে সময়টা নষ্ট করলেন ত ?"

সহাস্য মুখে বলিলাম, "কেন, নষ্ট করব কেন ? তোফা আরাম ক'রে ঘুম দিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠা গেল।"

ললিতবাবু বলিলেন, "আরে মশাই, ঘুম ত' চিরদিনই আছে, কিন্তু টুরিষ্টকার আছে কি ? ঘুমলে ত' টুরিষ্টকারের ভাড়াটাই মাটি।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কেন, মাটি কেন ?"

ললিতবাবু বলিলেন, "ঘুমলে টুরিষ্টকারই বা কি, আর থার্ড ক্লাসই বা কি ? কোনো তফাৎ থাকে কি ?"

ললিতবাবুর মন্তব্য শুনিয়া সমবেত কণ্ঠের একটা উচ্চহাস্য উত্থিত হইল।

বলিলাম, "ঘুমলেও তফাৎ থাকে।"

"কি তফাৎ শুনি ?"

"থার্ড ক্লাশে ঘুমলে স্বপ্ন দেখি, যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে, আর, তার মধ্যে প'ড়ে মাথা ঠোকাঠুকি চল্‌ছে, আর টুরিষ্টকারে ঘুমলে স্বপ্ন দেখি, যেন নীপশাখে ফুলডোরে-বাঁধা ঝুলনায় দুলছি।"

এবার উচ্চতর হাস্যধ্বনি উঠিল।

সহসা আমি বাস্তব জগৎ হইতে স্বপ্ন জগতে আশ্রয় লওয়ায় আক্রমণ চালাইবার বাগ হারাইয়া ললিতবাবু কুঞ্চিত-চোখে স্মিত-মুখে ক্ষণকাল

আমার দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। সে চাহনির অনেকটা অর্থ, 'ও হো হো! ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে!' তাহার পর ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক সুরে বলিলেন, "তা'হলে চা খেয়ে আবার একচোট দোল খাওয়ার চেষ্টা দেখবেন না কি?"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

বলিলাম, "না, এ গাড়িতে আর স্বপ্ন দেখা নয়। আবার স্বপ্ন দেখা রাত্রি এগারটার সময়ে রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলওয়ের গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে। তবে সে স্বপ্ন আর দোল খাওয়ার স্বপ্ন হবে না, সে স্বপ্ন হবে নগাধিরাজ হিমালয়ে আরোহণ করার স্বপ্ন।"

এবার আমরা পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিন দিক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি সোজা উত্তর দিকে হিমালয়ের অভিমুখে। বস্তুত, লক্ষ্ণৌ হইতে কাঠগুদাম একটি সরল রেখা টানিলে আমাদের বাকি রেলপথটুকু প্রায় অঙ্গাঙ্গি হইয়া তাহার সহিত মিশিয়া চলে। এই সরল রেখার উত্তর প্রান্ত কাঠগুদাম, সাধারণ সমতল ভুমি ও হিমালয়ের উন্নতানত ভুমিব সংযোগস্থল। এইখানে আমাদিগকে সমতল ভূমির সমস্ত ব্যবস্থা-বিধান পরিহার করিয়া অবলম্বন করিতে হইবে পার্বত্য ভূমিব বিধি-ব্যবস্থা। রেলগাড়ি পরিত্যাগ করিয়া সওয়ার হইতে হইবে ডাণ্ডি অথবা অশ্বপৃষ্ঠে।

বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া বাহিরের দ্রুত-অপসরণশীল দৃশ্যের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া ছিলাম। প্রতি মিনিটে, প্রতি মাইলে নিরন্তর হিমালয়ের সমীপবর্তী হইতেছি, এই চিন্তা মনে মনে আমাকে উল্লসিত করিতেছিল। আমরা বাঙলাদেশের সমতল ভূমির মানুষ, সমতল সমুদ্রবক্ষ আমাদিগকে তত আবিষ্ট করেনা, যত করে উচ্চনীচ পার্বত্যভূমি। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র, বীচিবিভঙ্গের দ্বারা, সময়ে সময়ে অসমতল মূর্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। কঠিন মৃত্তিকা এবং শিলারাশির দ্বারা গঠিত পর্বত-বক্ষের বাঁধা উর্মিমালা দুরপনেয় বস্তু। সাগরবক্ষের উর্মিমালা রাগিণীর তান, পর্বতবক্ষের উর্মিমালা অচল ঠাট।

বাহিরে সন্ধ্যার আবছায়া দেখিয়া বুঝিলাম টুরিষ্টকারের মেয়াদ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মোটামুটি আর ঘণ্টা দুইয়ের খুব বেশি নহে। ইহার মধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া নামিয়া যাইবার সকল আয়োজন শেষ করিতে হইবে।

পরিচারকদের মহলে বাঁধাবাঁধি পোবাপুরি ও ঠোকাঠুকির উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে ললিতবাবুর আদেশ-উপদেশের কণ্ঠস্বর।

তিমিরাবৃত প্রান্তরের বক্ষ বিদীর্ণ কবিয়া পাঞ্জাব মেল উন্মত্ত বেগে আগাইয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট স্টেশন পিছনে ফেলিয়া যাইবার সময়েই তাহার গতির যথার্থ মাত্রা উপলব্ধি করিতেছি।

সহসা কোন্ সময়ে গাড়ির গতি মন্থর হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; বেরিলি স্টেশনের সিগ্নালিং-এর ডাউন কেবিন পিছনে চলিয়া গেল, আমরা ধীরে ধীরে জুতার মধ্যে পা গলাইতে লাগিলাম।

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "উপেনবাবু, হাওড়া পর্যন্ত ফিরে যাবার টুরিষ্টকারের আংশিক ভাড়া (প্রতি মাইলে চাব আনা হিসাবে) ত' দেওয়াই আছে, মায়াবতী না গিয়ে চলুন এই গাড়িতেই কলকাতা ফেরা যাক।"

একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উঠিল।

বেরিলি পর্যন্ত আসিয়া মায়াবতী না গিয়া কলিকাতায় ফিবিবার প্রস্তাব হাসিবার মতই কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু ইহাব মধ্যে অন্তরের একটা যে অপ্রকাশ্য বৃত্তিরও যোগ ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ঘণ্টা ত্রিশেক নিরবসর ঘনিষ্ঠতার ফলে এই সুরূপা সুসজ্জিতা আরামদায়িনী বাহিনীটি গভীরভাবে আমাদের মনের মধ্যে মায়ার শিকড় বিস্তার করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব যদি সত্যই কার্যে পরিণত করা হইত তাহা হইলে নৈরাশ্যের প্রগাঢ় বেদনার মধ্যে একটা যে আনন্দের তন্ত্রীও ক্ষীণ সুরে বাজিত, তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং

আমাদিগকে বহন করিয়া কলিকাতাগামী পাঞ্জাব মেল ডাফরিন ব্রিজ পার হওয়ার পর হইতে আনন্দের সেই ক্ষীণ সুরটি ক্রমশ যে স্পষ্টতর এবং প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকিত, সে কথাও সাহস করিয়া বলা চলে। কলিকাতা ফেরা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের মন্তব্যের পর বুঝা গেল, ঘুমাইয়া টুরিষ্টকার নষ্ট করা সম্বন্ধে ললিতবাবুর মন্তব্য একই অঞ্চলের উৎস হইতে উৎপন্ন। উভয়ের মধ্যে মূলসুরগত বিশেষ কোনো বিরোধ নাই।

বেরিলির প্ল্যাটফর্মে আমরা যখন অবতরণ করিলাম, তখন রাত্রি আটটা।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ডাকঘর দেখিয়া চিঠি লিখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পোষ্টমাষ্টার একটি পশ্চিম দেশীয় যুবক, বিশেষ ব্যস্ততাসহকারে ডাক প্রস্তুত করিবার কার্যে ব্যস্ত আছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, “কি চাই আপনার?”

চাইত আমার সব-কিছুই। থাকিবার মধ্যে মনিব্যাগে অর্থ আছে। কহিলাম, “খাম, পোস্টকার্ড, এবং বিশেষ অসুবিধা যদি না হয়, দোয়াত কলম।”

পোস্টমাষ্টার এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া আমার ফরমায়েস মতো বাক্স হইতে খাম পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, যে-হেতু তিনি দোয়াত কলম লইয়া কাজ করিতেছেন, দোয়াত কলম দেওয়ার সুবিধা হইবে না;—তৎপরিবর্তে কপিয়িং পেন্সিল দিতে পারেন; এবং কপিয়িং পেন্সিল যে দোয়াত কলম হইতে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোনো কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে আমার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য তৎপর হইলেন।

উত্তরে আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে কপিয়িং পেন্সিলের উপযোগিতা সম্বন্ধে পোষ্টমাষ্টারের সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রকাশ পাইল।

দুইখানি চিঠি লিখিয়া লেটার-বক্সে ফেলিতে গেলাম। লেটার-বক্সে

ফেলিতে না দিয়া পোস্টমাষ্টার আমার হাত হইতে চিঠি দুইটি লইয়া ছাপ মারিয়া ব্যাগে পুরিলেন। কহিলেন, চিঠি দুইটি বাক্সয় ফেলিলে কলিকাতায় রওনা হইতে একদিন বিলম্ব হইত। এই অযাচিত অনুগ্রহে আপ্যায়িত হইয়া পোস্টমাষ্টারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রাত্রি এগারটার সময়ে রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলের গাড়ি ছাড়িবে, সুতরাং হাতে সময়ের অভাব নাই। স্টেশন প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া কাছাকাছি সহরের খানিকটা অংশ ঘুরিয়া আসা গেল। তাহার পর আহারাদি সারিয়া কাঠগুদামের গাড়িতে যখন সওয়ার হইলাম, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

১৭

প্রত্যুষে পাঁচটার সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি পৃথিবীর মানদণ্ড পর্বতরাজ হিমালয়ের পাদদেশ কাঠগুদামে পেঁাছিয়াছি। বেরিলি হইতে কাঠগুদাম সমস্ত পথ সারারাত্রি ঘুমের মধ্যে অগোচরে কাটিয়াছে।

গাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া মন নাচিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ, গম্ভীর, বিপুল, রহস্যাবৃত পর্বতের শ্রেণী পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, যেন আদি নাই, অন্ত নাই। এই দেব-ঋষি-মুনি-পবিত্র হরপার্বতীর তপস্যাক্ষেত্র যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরবধূর লীলানিকেতন চিরপুরাতন চিরনবীন হিমগিরির নব্বই মাইল পথ ধীরে-ধীরে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে মায়াবতী পেঁাছিতে হইবে।

এ পথ লৌহ-রেলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, এ পথে এঞ্জিন নাই, হুইস্‌ল্‌ নাই, গার্ড নাই, গার্ডের সবুজ পতাকা নাই। এপথে গিরিপাদপ সকল তাহাদের হরিৎ পল্লবের নিশান উড়াইয়া আমাদিগকে 'লাইন ক্লিয়ার' দিবে; এবং কীচক-বংশ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া বায়ু বাঁশি বাজাইবে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এ পথে লোটা-বালটি হস্তে পানিপাঁড়ে দেখা দিবেনা; স্বয়ং গিরিনির্ঝরিণী অঞ্জলি ভরিয়া সুশীতল পানীয়ের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে। এপথ আমাদের 'আনন্দায় ভবতু'।

ট্রেন হইতে নামিয়া শুনিলাম, সোজা পথে আমাদের মায়াবতী যাওয়া চলিবেনা, আলমোরা হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে আমাদের এক দিনের পথ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু উপায় নাই। ভাবিলাম, ভাগ্যে উপায় নাই! শাপে বর হইয়াছে। একদিনের পথ বাড়িয়া যাওয়ার মানে হিমালয়ের সহিত আমাদের পরিচিত হইবার সুযোগ একদিনের দ্বারা বিস্তৃততর হওয়া।

কুলি, ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া কাঠগুদাম হইতে আমাদিগকে রওয়ানা করাইবার জন্য স্টেশনে একটি বাঙালী ভদ্রলোক

উপস্থিত ছিলেন। ইনি কাঠগুদামে বাস করেন ; অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ইঁহার উপর আমাদের তদ্‌বিরের ভার দিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট অবগত হইলাম, কুলিদের লইয়া একটা কোনো গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কাঠগুদাম হইতে মায়াবতী পর্যন্ত একটানা কুলি পাওয়া যাইবেনা। কাঠগুদাম হইতে আলমোরা পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত কুলি-সার্ভিস্ আছে। সেই জন্য আলমোরা হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে। আলমোরা হইতে পুনরায় নূতন কুলি সংগ্রহ করিয়া লওয়া চলিবে। শুনিলাম, আলমোরায় কুলির অভাব হইবে না।

মালপত্র ওজন করিতে ও যথোপযুক্ত কুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের রওয়ানা হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গেল। এই ওজন করা ব্যাপারটি সহজ নহে। প্রত্যেক কুলি বহন করিতে পারে এমন পৃথক ও সমভাবে সমস্ত জিনিষ ওজন করিয়া ভাগ করা, শুধু সময়ের নহে, কৌশলের কাজ। পাঁচটার সময়ে আমরা রেল হইতে নামিয়াছিলাম, বেলা নয়টার সময়ে দেখা গেল আমাদের ডাণ্ডি ও একান্ত অপরিহার্য দ্রব্য বহন করিবার মতো কুলি কোনো প্রকারে সংগ্রহ হইয়াছে। আর অধিক বিলম্ব করিলে সেদিন আমরা সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের রাত্রি যাপনের স্থান রামগড়ে উপস্থিত হইতে পারিবনা বলিয়া আমরা আমাদের অধিকাংশ জিনিস পশ্চাতে ফেলিয়া যাত্রা করিলাম। বাঙালী ভদ্রলোকটি আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন, আমাদের জিনিষপত্র যাহাতে আমাদের সহিত একই সময়ে রামগড়ে পৌঁছিতে পারে সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

আমাদিগকে বহন করিবার জন্য আটখানা ডাণ্ডি, একটা ডুলি ও কয়েকটি ঘোড়া ছিল। শ্রীমান্ ভোম্বল অশ্বারোহী হইয়া অগ্রগামী হইলেন, এবং পশ্চাতে আমরা দোলায় চড়িয়া দুলিতে দুলিতে অনুগামী হইলাম। যাঁহারা কখনো ডাণ্ডি দেখেন নাই, তাঁহাদের জন্য ডাণ্ডির একটু বিবরণ দিলে ভাল হয়। ডাণ্ডি এক প্রকার মনুষ্যবাহিত যান, কিন্তু পাল্কি ডুলি অথবা খাটুলির মতো নহে। একটি কাঠের হাতল-

ওয়ালা খাড়া চেয়ারের দুই পার্শ্বে মজবুত দুইটি কাষ্ঠদণ্ড লম্বালম্বি ভাবে সংযুক্ত করিয়া সেই সমান্তরাল দুইটি দণ্ডের দুই প্রান্তে, চেয়ারের সামনের দিকে ও পশ্চাতে অপর দুইটি দণ্ড আড়া-আড়ি ভাবে লাগাইয়া চারজন মানুষের স্কন্ধে ব্যাপারটি বাহিত হইলে অনেকটা ডাণ্ডির কাছাকাছি গিয়া পেঁছায়। ইহার উপর, রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সামান্য একটু আচ্ছাদনের, এবং পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিবার জন্য একটা পাদানের ব্যবস্থা থাকে।

বেলা নয়টার পর আমরা কাঠগুদাম ছাড়িয়া অগ্রসর হইলাম। কাঠগুদাম অনেকেরই নিকট পরিচিত, কারণ নাইনিতাল, আলমোরা, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে কাঠগুদাম হইয়াই যাইতে হয়। স্টেশনের পিছন দিকে পথের উপর যাত্রিগণের জন্য ডাণ্ডি, টঙ্গা ও ঘোড়া অপেক্ষা করিতেছিল। পর্বতারোহীর সংখ্যা দেখিলাম নিতান্ত অল্প,—কারণ আসন্ন শীত ঋতুর জন্য পাহাড় ছাড়িয়া নামিয়া আসিবার সময় পড়িয়াছে।

একটি ডাকবাংলো, কয়েকটি ক্ষুদ্র দোকান এবং দশ বারোখানা ঘোড়ার আস্তাবল লইয়া কাঠগুদাম। সহর নহে ; এমন কি, গ্রামও নহে ; সমতল ভূমির সুখ-সুবিধা এবং পর্বতচূড়ার স্বাস্থ্য ও শৈত্য, এতৎ উভয়ের কোনোটাই নাই বলিয়া স্থায়ীভাবে কেহও এখানে বাস করেনা। যাহারা করে তাহারা একান্তই ব্যবসার খাতিরে করে, এবং সে ব্যবসায় একমাত্র যাত্রিগণের চাহিদার মধ্যেই নিবদ্ধ। সুতরাং এক হিসাবে কাঠগুদামকে একটি বৃহদায়তন যাত্রীনিবাস বলা চলে। পর্বতারোহণের সু-উচ্চ সোপানের ইহা প্রথম ধাপ।

স্টেশন প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়াই কাঠগুদামের বাজারের পথ। বাজার ছাড়াইয়া মাইলখানেক অতিক্রম করার পর দেখিলাম পথখানি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুই দিকে গিয়াছে। বামদিকের পথটি নাইনিতাল গিয়াছে, দক্ষিণ দিকেরটি আমাদের গন্তব্যস্থল আলমোরায়। নাইনিতালের

পথ অপেক্ষা আলমোরার পথ অনেক অপ্রশস্ত এবং নিকৃষ্ট। সেইজন্য আলমোরার পথে টঙ্গা চলেনা ডাণ্ডি অথবা ঘোড়া ভিন্ন উপায় নাই।

ডাণ্ডির উপর আরূঢ় হইয়া, কখনো বা ইচ্ছাসুখে পদব্রজে, আমরা ধীরে ধীরে পর্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। বেলা বাড়িবার সহিত সূর্যের কিরণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল বটে, কিন্তু যতই আমরা উপরে উঠিতেছিলাম বায়ু ততই শীতল হইতেছিল বলিয়া রৌদ্রে তেমন কষ্টবোধ ছিলনা। তদ্ভিন্ন, মন বিক্ষিপ্ত এবং প্রফুল্ল থাকিবার পক্ষে আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বিচিত্র এবং মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য; দ্বিতীয়তঃ, ডাণ্ডিওয়ালা কুলিদের গল্প। এই ডাণ্ডিওয়ালা কুলিগুলি অদ্ভুত সরল প্রকৃতির মানুষ। গল্প শুনিতে ইহারা যেমন ভালবাসে, গল্প বলিতেও তেমনি মজবুত। ইহাদের এই প্রকৃতি বিচিন্তন করিয়া আমার মনে হইল, বিদেশী লোকের নিকট গল্প শুনিয়া এবং বিদেশী লোককে গল্প শুনাইয়া ইহারা পথশ্রমের ক্লেশ হইতে নিজেদের কতকটা অন্যমনস্ক রাখে। কথোপকথনের মধ্য দিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ দেওয়াই নহে, আনন্দ পাওয়াও। দেখিলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবাধে নানা বিষয়ে আমাদের কথোপকথন ও আলোচনা চলিয়াছে।

দৈবক্রমে একটি বিচিত্র ব্যাপার অবগত হইলাম। ডাণ্ডিওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলিদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ। তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই বেশি। মুসলমান ত একেবারেই নদারৎ, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও নিতান্ত অল্প। আমার ডাণ্ডির চারজন কুলির মধ্যে সম্মুখের দুইজনের স্কন্ধে উপবীত লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতের দুইজনেরও যখন দেখিলাম একই অবস্থা, এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম চারজনই ব্রাহ্মণ, তখন মনের মধ্যে একটা অলৌকিক কুণ্ঠা অনুভব না করিয়া পারিলাম না। চারজন ব্রাহ্মণের স্কন্ধে বাহিত হইবার পরম সৌভাগ্য জীবদ্দশাতেই অদৃষ্টে লিখিত ছিল তাহা জানিতাম না। মহাপ্রস্থানের

দিনই ওরূপ সমারোহের সহিত যাত্রা করা যাইবে, মনে মনে সেই ধারণাই ছিল।

মৃত্যুর পরে যাহা প্রাপ্য মৃত্যুব পুর্বে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিলেই জীবাত্মা বোধ করি তৃপ্তি বোধ করে। বায়ুভূতো নিবালম্ব হইবার পুর্বে কঠিন ধরণীর সচেতন মৃত্তিকা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় কল্পনা করিতে ভাল লাগেনা। অনন্তকালবর্তিনী ধরণীর সহিত আমাদের এই অনিশ্চিত জীবনের স্বল্পস্থায়ী মেয়াদকে আমরা দৃঢ ও চিরস্থায়ী ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। একথা একবারও মনে কবিনা যে, অন্তবিহীন জীবন-রেলপথে মৃত্যু একটি বড ধরণের জংশন, যেখানে গাড়ি বদল করিতেই হইবে, মালপত্র ছডাইযা সংসার পাতিযা নিজের কামরাটিতে বসিযা থাকিলে চলিবেনা। ভুলিযা যাই যে, ইস্ট্ ইণ্ডিযান্ রেলওযে কর্মচারীর দৃষ্টি এড়ানো হযত' সম্ভব, কিন্তু এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মচারীর দৃষ্টি এড়াইবার উপায নাই,—যথাস্থানে যথা-সময়ে সে ঘাড় ধরিযা নামাইযা দিবেই।

আমার ডাণ্ডিওযালা চারজনই ব্রাহ্মণ দেখিযা কৌতুহলাক্রান্ত হইযা অনুসন্ধান করিযা জানিলাম, প্রায সমস্ত ডাণ্ডিওযালা এবং ভারবাহী কুলিই ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয। এ শুধু এখানেই নহে; কাঠগুদাম হইতে মাযাবতী, এবং মায়াবতী হইতে টনকপুর সর্বত্রই এই অবস্থা বর্তমান। দ্বিজ-জাতির এরূপ অধঃপতন দেখিযা খুব বেশি দুঃখিত হইলামনা। বুঝিলাম, কুমাউন প্রদেশের এই পার্বত্য অঞ্চলে মহাকাল তাঁহার ভাঙনের কারখানার একটি শাখা খুলিযাছেন; এবং সেই শাখা-কারখানায় বিপুলায়তন হাতুড়ির আঘাতে গুণকর্ম বিভাগের লৌহ-কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিযাছে।

শিমলা যাইবার পথে ও শিমলা সহরে যে-সকল কুলি দেখিয়াছি, তাহারা পাঠান কিংবা নিম্ন শ্রেণীর পাহাড়ি হিন্দু; ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কুলি একটিও দেখি নাই। দেখিলাম শুধু এই মায়াবতীর পথে।

কুলিগণের নিকট, এবং পরে অন্যত্র, অনুসন্ধান করিয়া ইহার কারণ নির্ণয় কবিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সুদূর অতীত হইতে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত কুমাউন প্রদেশে এক হিন্দু রাজবংশের রাজত্ব চলিত ছিল, এবং তাহার কয়েকটি রাজধানীর মধ্যে হিমালয়ের দুর্গম এবং নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থিত চম্পাবতীও ছিল একটি রাজধানী। এই হিন্দু রাজবংশের শাসনকালে বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরিবাব এই রাজ্যে আসিয়া বাস করে; বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশাঞ্চলে মুসলমান প্রভাব যখন খুব বাড়িয়া উঠে, সেই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া এই পার্বত্য হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় লয়। তাহাদেরই বংশধরগণের এখন এই অবনত অবস্থা। প্রধানতঃ কৃষিই ইহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়, তদুপরি ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইহাদিগকে কুলির কার্যও করিতে হয়। অনিচ্ছায় কিরূপে, সে কথা পরে বলিব।

কাঠগুদামের পরে আমাদেব প্রথম আশ্রয় লইবার স্থানের নাম ভীমতাল। ভীমতাল মায়াবতী হইতে আট মাইল পথ। কথা ছিল ভীমতালে পৌঁছিয়া তথায় আহারাদি সারিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র আমরা বাহির হইয়া পড়িব, এবং সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের রাত্রি যাপনের স্থল রামগড় পৌঁছিব। রামগড ভীমতাল হইতে এগার মাইল দূরে।

বেলা বাড়িবার সহিত দেখিলাম দলে দলে লোক পর্বতের উচ্চ প্রদেশ হইতে, প্রধানতঃ আলমোরা জেলা হইতে নামিয়া আসিতেছে। শীতকালে দরিদ্র লোকের পক্ষে পাহাড়ের উপর বাস করা নানা কারণে অসুবিধাজনক। যথোচিত শীতবস্ত্রের অভাবে দুর্জয় শীতভোগ করা কষ্টকর, দুর্মূল্য ইন্ধনের দ্বারা আগুন জ্বালিয়া শীত নিবারণও ব্যয়সাধ্য, তাহা ছাড়া, ঘোড়া গরু মহিষ ছাগল প্রভৃতি পশুর আহার্য দুর্লভ এবং অক্রেয় হইয়া উঠে। এই সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে শীতের প্রারম্ভে অনেকেই পাহাড় হইতে নামিয়া আসে, এবং শীতকালের কয়েক মাস সমতল ভূমিতে কাটাইয়া শীতের শেষে পুনরায় উপরে ফিরিয়া যায়।

বিশেষ আগ্রহ ও কৌতুকের সহিত আমরা এই নিম্নদেশগামী যাত্রি-গণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক-একটি পরিবার, কখনো বা দুই তিনটি পরিবার একত্র হইয়া নামিয়া চলিয়াছে,—সঙ্গে লাদ্দু ঘোড়ার পিঠে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য। যাহাদের গো মহিষ ছাগল আছে, তাহারা নিজ নিজ পশু হাঁকাইয়া চলিয়াছে। প্রায় সকলেই পদব্রজে গমন করিতেছে; যাহারা নিতান্ত অশক্ত ও অক্ষম, যথা অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও রোগার্ত, তাহারা মাল-বোঝাই ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিয়াছে। যাহারা সক্ষম তাহাদের শুধু হাঁটিয়াই অব্যাহতি নাই,—যুবকগণের মাথায় বা পৃষ্ঠে বোঝা, যুবতীদের ক্রোড়ে শিশু। একটি ঘোড়ার পিঠে দেখিলাম জিনিসপত্রের মধ্যে একটি অশীতিপরা বৃদ্ধাকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া বসাইয়া দিয়াছে, বৃদ্ধার ক্রোড়ে একটি বছর তিনেকের বালক, সম্ভবতঃ বৃদ্ধার প্রপৌত্র। সঙ্গে ক্যামেরা ছিলনা বলিয়া মনে গভীর পরিতাপ হইল। থাকিলে বৃদ্ধা, বালক ও ঘোড়া লইয়া এই যৎপরোনাস্তি কৌতুকজনক সঙ্ঘের ছবি তুলিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতাম না।

রমণীগণের মধ্যে কয়েকটি দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী। সুশ্রী কিন্তু অধিকাংশই। বর্ণ, গঠন এবং আকৃতি, সর্বতোভাবেই ইহারা সৌন্দর্য্যের উচ্চ স্তরের প্রাণী। অনেকের ধারণা আছে যে, পাহাড়ি রমণী মাত্রেই দেখিতে সুন্দরী হয়। এ ধারণা কিন্তু সাধারণত নির্ভুল নহে। যাহারা পাহাড়ের আদিবাসিনী, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ আকৃতিগত সৌষ্ঠব অল্পই দেখা যায়। পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশাঞ্চলে এক বণিক শ্রেণী আছে, সেই শ্রেণীর রমণীগণ দেখিতে অপরূপ সুন্দরী। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের গিরিনগরীগুলিতে এই শ্রেণীর বণিক বা বেনিয়া অনেকে আসিয়া বাস করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া শীতপ্রধান দেশে বাস করার ফলে ইহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব, বিশেষত দেহের বর্ণ, বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

শিমলা অঞ্চলের রমণীগণের ন্যায় এখানকার স্ত্রীলোকেরা শালোয়ার ব্যবহার করেনা; তৎপরিবর্তে পেশোয়াজ বা ঘাঘ্‌রা ব্যবহার করে। তবে শিমলার ন্যায় অঙ্গাবরণ ও ওড়নার ব্যবহার এদেশেও যথেষ্ট প্রচলিত।

কুলিদের মুখে ভীমতালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ শুনিয়া ভীমতাল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। নাইনিতালের মতো ভীমতালেও একটি বৃহৎ তাল অর্থাৎ হ্রদ আছে, যাহা হইতে ঐ স্থানের নাম হইয়াছে ভীমতাল।

ভীমতালের এই ভীম ব্যক্তিটি কোন্ ভীম,—মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব, অথবা অপর কেহ, সে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, ইনি মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ব্যতীত অন্য কেহও নহেন, কারণ এ অঞ্চলে বৃকোদরের যে গতায়তি ছিল তাহার প্রমাণ মায়াবতী পথেই আমরা পরে পাইয়াছিলাম।

বেলা একটার সময়ে আমরা ভীমতালে উপনীত হইলাম।

কুলিগণের মুখে ভীমতালের সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, ভীমতালে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই মানস ভীমতাল হইতে বাস্তব ভীমতাল কিছুমাত্র অপকৃষ্ট নহে। প্রকৃতির এই মধুর ও বিশাল সৌন্দর্য-সমাবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আমরা পথক্লেশ একেবারে বিস্মৃত হইলাম। দীর্ঘ-প্রসারিত সুবিশাল হ্রদ আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে; চতুষ্পার্শ্বে বিরাট পর্বত-শ্রেণীর গগনভেদী প্রাচীর ও হ্রদের ধার দিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া পরিচ্ছন্ন পথ; পথের ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য গৃহরাজি। দেখিয়া মনে হইল সহসা যেন আমরা কোনো সযত্ন-অঙ্কিত চিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছি।

ভীমতালে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিলাম ভীমতালের ক্ষুদ্র বাজার। দশ-বারোটি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান লইয়া এই পণ্যস্থলী, কিন্তু প্রত্যেক দোকানেই, বিশেষত সূতীবস্ত্র ও শীতবস্ত্রের দোকানে, ক্রেতার সংখ্যা অল্প নহে। শুধু স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিলে এ সকল দোকানের চলেনা; নিকটবর্তী কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামের প্রয়োজনীয় পণ্য ভীমতালের এই দোকানগুলি হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আলমোরা এবং কাঠগুদামের যাত্রিগণও এই দোকানগুলির বাঁধা খরিদ্দার।

বাজার অতিক্রম করিয়া আমরা তালের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। পর্বতের এত উপরে এই বিশাল অচপল জলরাশির অবয়ব আমার মনের মধ্যে একটা ভীতি-বিস্ময়-হর্ষমিশ্রিত অননুভূতপূর্ব চেতনার সৃষ্টি করিল। সাধারণত পাহাড়ের উপরকার জলের বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং ধারণা পার্বত্য স্রোতস্বিনীর মধ্যেই নিবদ্ধ। সে জল চঞ্চল এবং গতিশীল। পর্বতের সু-উচ্চ ক্রোড়ে এই নিবিষ্ট-স্থির

জলদেহ দেখিয়া মনে হইল, যোগেশ্বরের আলয়ে ইহা সেই মহাবৈরাগ্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে একটিমাত্র কণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেন যোগনিবদ্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

কুলিগণের মুখে শুনিলাম এই হ্রদের গভীরতা এত অধিক যে, এ পর্যন্ত ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। শুনিলাম, কদাচিৎ কখনো-সখনো এই গভীরতা মাপিবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইয়া থাকে। মজবুত গুঁড়ি এবং লৌহদণ্ডে নির্মিত সুদৃঢ় মঞ্চে বৃহদায়তন কপিকল খাটাইয়া, তিন-চার মাইল দীর্ঘ মোটা কাছির এক প্রান্তে গুরুভার লৌহতাল বাঁধিয়া, পূর্বোক্ত কপিকলের উপর দিয়া কাছি চালাইয়া সেই লৌহতালকে ধীরে ধীরে হ্রদগর্ভে নামাইয়া দেওয়া হয়। কুলিগণ বলিল, কাছি শেষ হইয়া যায়, তথাপি লৌহতালের অধোগতির বিরাম ঘটে না।

শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, unfathomable।

সময় বিশেষে এক-একটা কথার দ্বারা ব্যঞ্জনার এমন মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, যেমন সেই জাতীয় অপর কোনো কথার দ্বারা সম্ভব হয় না। unfathomable শব্দটি শুনিয়া আমাদের মন একটা অনির্দেশ্য আতঙ্কে শির্ শির্ করিয়া উঠিল। ইহার পরিবর্তে অগাধ, অতল অথবা অথই শব্দ ব্যবহার করিলে হয়ত' ঠিক তেমনটা হইত না। অগাধ জলে ডুবিয়া মরা তবু চলে, কিন্তু unfathomable জলে কিছুতেই নহে!

কি ভয়াবহ এই unfathomable ভীমতালে ডুবিয়া মরা! কে জানে মৃতদেহ তলাইতে তলাইতে আট-দশ মাইলই তলাইয়া যাইবে, অথবা শেষ পর্যন্ত একেবারে চার হাজার মাইল নিম্নে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়াই উপস্থিত হইবে! অবশ্য জীবনের মূল্য ধরিয়া হিসাব করিলে সাড়ে-চারহাত-গভীর ডোবার জলে ডুবিয়া মরা, আর ভীমতালের অতলে তলাইয়া যাওয়ার মধ্যে প্রভেদের কড়াক্রান্তিও থাকে না। কিন্তু মৃত্যুর পর ওদিকে ত' আত্মা-বিহঙ্গ মহাব্যোমের নীলিমার মধ্যে উড়িয়া গিয়া

উধাও হইল, তাহার উপর এদিকে দেহপিঞ্জরও যদি অতল গভীর জলের মধ্যে তলাইয়া গিয়া বেহাত হয়, তাহা হইলে সান্ত্বনার জন্য আর বাকি কি থাকে! ডোবার জলে ডুবিয়া মরিলে তবু দেহটাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া খানিকটা আপসা-আপসি করিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

ভীমতালের অতলস্পর্শতার কথা ভাবিলে ভয় হয় বটে, কিন্তু মানুষের মনে ভয়াবহের প্রতি আকৃষ্ট হইবারও একটা ব্যবস্থা আছে। পুরীর সৈকতভূমিতে দাঁড়াইলে মহাসমুদ্রের ভয়াবহ উর্মিমালা আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। মনে হয়, যাহা হইবার হইবে, ঝাঁপাইয়া পড়ি! পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়াইয়া নিচের দিকে তাকাইলেও মনে হয়, যাহা হইবার হইবে, লাফাইয়া পড়ি! ভয়াবহ আমাদিগকে ভয় দেখায়, কিন্তু অনেক সময়ে সেই ভয়ের সহিত আনন্দের রসও মিশাইয়া দেয়। সুবর্ণের উপর রসানের যে ক্রিয়া, আনন্দের উপব আতঙ্কেরও ঠিক তাহাই। উভয়েই আদত বস্তুর রঙকে গাঢ়তর করে।

এই হ্রদের পরিধি অল্পাধিক মাইল-দেড়েক হইবে মনে হইল। ইহার অর্ধাংশ অতিক্রম করিয়া আমরা হ্রদের অপর দিকে ডাকবাংলায় উপনীত হইলাম। ডাকবাংলা যাইবার জন্য একটি সেতু অতিক্রম করিতে হয়। হ্রদ হইতে ইচ্ছা-মত জল বাহির করিয়া নিম্নপথে চালাইয়া দিবার জন্য এই সেতুর নিচে একটি ব্যবস্থা আছে। সেই পথ দিয়া অল্প অল্প জল বাহির হইয়া অতি দ্রুতগতিভরে নিচে নামিয়া যাইতেছে, এবং তদ্দ্বারা এমন প্রবল কলনাদের সৃষ্টি করিতেছে যে, এক মিনিট চক্ষু বুজিয়া সেই গর্জন শুনিলে মনে হয়, চাহিয়া দেখিব হ্রদের সমস্ত জল বাহির হইয়া গিয়াছে।

সমুদ্রস্তর হইতে ভীমতাল ৪৫০০ ফুট উচ্চ। স্থানীয় ডাকবাংলাটি ক্ষুদ্র নহে বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্নও নহে। আসবাবপত্রের অধিকাংশ বে-মেরামত এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কিন্তু স্থানটি অতিশয় মনোরম এবং আরামদায়ক। একটি উচ্চ পাহাড়ের শিখর দেশে সমতল ক্ষেত্রের

উপর বাংলোটি নির্মিত। চতুর্দিকে খোলা জায়গা ; নিম্নে তালের শান্ত জলবিস্তারের অপরূপ দৃশ্য ; এবং তাহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া ভীমতালের ত্রি-চতুর্থ অংশ একটি পরিচ্ছন্ন চিত্রের মতো পরিদৃশ্যমান। আমরা বাংলো-প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে আমাদের ডাণ্ডিগুলিকে চেয়ারের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বসিয়া বসিয়া নিমজ্জিত মনে এই সৌন্দর্যসুধা পান করিতে লাগিলাম।

শুনিলাম নাইনিতালের কোনো কোনো স্থান হইতে ভীমতালের হ্রদ দেখা যায়। কুলিগণ আমাদিগকে নাইনিতালের পাহাড় দেখাইয়া দিল, কিন্তু সেইটাই যে নাইনিতালের পাহাড়, তাহাদের কথা বিশ্বাস করা ভিন্ন, তাহার অন্য কোনও প্রমাণ পাইবার উপায় ছিল না।

ভীমতালের শোভাময় দেহের উপর শেষবার চক্ষু বুলাইয়া যখন আমরা পথে বাহির হইলাম তখন বেলা তিনটা।

১৯

ভীমতাল হইতে আমাদের যাইতে হইবে এগার মাইল দূরবর্তী রামগড়ে, এবং সেই গড়ে আমাদের রাত্রিযাপনের শিবির সন্নিবেশ করিতে হইবে। সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বে আমরা যে রামগড়ে পৌঁছিতে পারিব, মাইলচারেক পথ অতিক্রম করার পর, তদ্বিষয়ে দুরাশাও আমাদের মন হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী প্রধানা রাজসহচরীকে দেখিলে যেমন বুঝা যায় পশ্চাতে মহারাণী আসিতেছেন, তেমনি আশ্বিন-শেষের অপরাহ্ণ বেলাকে দেখিয়া বুঝা গেল, সন্ধ্যারাণী সুদূর-অবস্থিতা নহেন। গাছের ডগায় ডগায় রৌদ্র পীতাভ হইয়া আসিয়াছে, সুদূরের পর্বতগুলি ধূসর-বেগুনি রঙের আচ্ছাদনে নিজেদের ঢাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং পূর্বাকাশের উজ্জ্বল নীলিমার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম প্রলেপ পড়িয়া আসিতেছে যাহা পশ্চিমাকাশের সহিত মিলাইয়া না দেখিলে সহজে ধরা পড়েনা।

আরও কয়েক মাইল চলার পর সহসা একসময়ে দেখা গেল সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ প্রায়; পূর্ব দিকে সন্ধ্যার কমনীয় মূর্তি দেখা দিয়াছে, পূর্বাকাশের পরিবর্তে পশ্চিম আকাশে প্রলেপ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আর, সেই প্রলেপের সুযোগ-গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়ার 'ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা' আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া আগাইয়া-পিছাইয়া চলিয়াছিল, তদনুসারে শ্রীমান ক্ষীণ শশাঙ্কও কখনো আগে, কখনো পাশে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে বিরাজ করিতেছিল। হঠাৎ দেখি কখন্ সে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে,—হিমাচলের অন্তরালে, অথবা অস্তাচলের নিম্নদেশে, তাহা বলা কঠিন। সে যাহাই হোক, ফল একই হইয়াছে,—যে সামান্য আলোকটুকু সে বিকিরণ করিতেছিল তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

ইত্যবসরে তরুণী নিশীথিনী অন্ধকারের অঞ্জন মাখাইয়া রঙে রেখায় বৈচিত্র্যময় নিসর্গকে একেবারে একরঙা সিলুয়েট (Silhouette) চিত্রে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতির এই অভিনব প্রশান্ত মূর্তি নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করিব সঙ্কল্প করিয়া সংহত হইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে আমার পিছনদিকের এক কুলি ডাকিল, "বাবুজী।"

বলিলাম, "কি?"

"রাত্রিকালে এখানে ভাল্ (ভল্লুক) নামে।"

সর্বনাশ। এই সিলুয়েটের মধ্যে যদি ভাল্ নামে তাহা হইলে জড়াইয়া ধরিবার পূর্বে তাহাকে ত দেখাই যাইবেনা। বলিলাম, "নামে যদি, উপায় কি করবে?"

কুলি বলিল, "উপায় আছে। কিন্তু এত কম শীতে, আর এত কম রাত্রে নামবে না।"

ভাবিতেছি বলিব, তাই যদি, তা হ'লে এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া খানিকটা হৃদ্‌স্পন্দন বাড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল!—এমন সময়ে শুনা গেল অগ্রভাগে ডাণ্ডিতে বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ললিতবাবু বলিতেছেন, "জেল্‌দি চলো! জেল্‌দি চলো।"

চকিত হইয়া উঠিলাম। তবে সত্যসত্যই ভাল্ নামিল না-কি। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ভাল্ নহে,—রামগড়ে পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইলে আহারাদি সারিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই ললিতবাবু 'জেল্‌দি চলো' বলিয়া কুলিদিগকে তাড়না দিতেছেন।

'জেল্‌দি' অবশ্য জল্‌দি। 'জেল্‌দি' বলিয়া ললিতবাবু বিশুদ্ধ পারসীক উচ্চারণের চেষ্টায় ছিলেন।

কিন্তু জেল্‌দি চলিবার উপায় কোথায়? এঞ্জিনে দম চড়াইয়া কি লাভ, পিছনের চাকায় যদি ব্রেক বাধা দেয়। ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে দুজনের জ্বর আসায় দুইখানি ডাণ্ডির, কাজে কাজেই সকল ডাণ্ডিরই, গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছিল। ললিতবাবুর পক্ষ হইতে তাড়নার ও

উৎসাহ উদ্দীপনার শৈথিল্য না থাকিলেও রাত্রি আটটার পুর্বে রামগড় পৌঁছান সম্ভব হইল না।

ডাকবাংলায় উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রথম কাজ হইল পীড়িত ডাণ্ডিওয়ালাদ্বয়ের ও আরও দুইজন ভারবাহী কুলির চিকিৎসা করা। তাহারা সচল না হইলেই আমাদের পক্ষে সচল হওয়া সম্ভব হইবে। মাত্র চার পাঁচটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমাদের কাছে ছিল। সেগুলির সহিত পীড়ার লক্ষণ মিলাইয়া দেখা গেল, দিতে হইলে একমাত্র বেলেডোনাই দেওয়া চলে, কারণ জ্বরের সহিত প্রবল মাথাধরাই ছিল পীড়ার প্রধান লক্ষণ। আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক, অথবা মহাত্মা হ্যানিম্যানের স্বর্গস্থিত আত্মার শান্তি যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেই কারণেই হউক, চারজন রোগীরই ঠিক একই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুম্। আমি চিকিৎসক হইয়া নিজেই মনে মনে বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া প্রত্যেককে এক-এক ফোঁটা বেলেডোনা সেবন করাইলাম।

প্রত্যুষে উঠিয়া সংবাদ পাওয়া গেল চারজন রোগীই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছে। চিকিৎসার এরূপ সন্তোষজনক রিপোর্ট পাইয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধের চমকপ্রদ কার্যক্ষমতার সপক্ষে আমাদের মধ্যে কয়েকজন দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিলেন; এবং ঔষধ নির্বাচন বিষয়ে আমার বিস্ময়জনক যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া প্রশংসমান হইলেন। আমি কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে এই প্রশংসা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বারংবার মনের মধ্যে সংশয় হইতে লাগিল, বেলেডোনার পরিবর্তে ভেরাট্রাম প্রয়োগ করিলেও রোগী চারজন আজ সকালে এইরূপই চাঙ্গা হইয়া উঠিত। ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিবার জন্য যাহাদের দেহ ও মন ষোল-আনা প্রস্তুত হইয়া আছে, এবং ঔষধ খাইলেই রোগমুক্ত হইব, এইরূপ বিশ্বাসের সঞ্জীবনী কবচ ধারণ করিয়া যাহারা রোগমুক্তির অর্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পক্ষে

বেলেডোনাই বা কি, আর ভেরাট্রামই বা কি! আমার এ ধারণা যে নিছক কল্পনা নহে, তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

সমুদ্রস্তর হইতে রামগড ৬,০০০ ফুট উচ্চ। এখানকার ডাকবাংলাটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবপত্রও ভাল। এই রামগড়ে কবি রবীন্দ্রনাথের একটি গৃহ আছে। ইচ্ছা ছিল, অন্ততঃ দূর হইতেও একবার কবির আলয় দর্শন করিয়া আসিব। কিন্তু ইচ্ছাপুরণ করিবার জন্য ডাকবাংলা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই পরবর্তী চটি পিউড়ার জন্য যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া আমরা পিউড়ার পথের পথিক হইলাম।

ভ্রমণ বিষয়ে একটা বড় রকমের সৌভাগ্য-যোগ না থাকিলে পিউড়ার পথের পথিক হওয়া যায় না। রামগড় হইতে পিউড়া পর্যন্ত পথের শোভা ও সম্পদের তুলনা নাই। আকাশ নির্মল, ঘন নীল; বায়ু সুশীতল; রৌদ্রকরজালের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের স্পর্শ; এবং শেষ শরতের বর্ষণ-ধারায় অচিরস্নাত পাহাড়-পর্বত গাছপালা লতা-গুল্মের মধ্যে সজীব সবুজের প্রাণখোলা সমারোহ। দূরে পর্বতে পর্বতে সুসজ্জিত দীর্ঘ পাইন গাছের বিস্তৃত কুঞ্জ,—দেখিলে মনে হয় শৈশবকালে কেহ যেন তাহাদিগকে সযত্নে সুপরিকল্পনায় ঐ ভাবে রোপিত করিয়াছিল। পথেব একদিকে নানাবিধ ফার্ণ ও বনপুষ্পে খচিত পর্বতগাত্র, অপর দিকে গভীর খড্ সুনিম্ন অধিত্যকায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই নয়নানন্দকর পথের উপর দিয়া আমাদের বৃহৎ বাহিনীটি উঠিয়া-নামিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া সরীসৃপ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। মনে হইতেছিল হিমালয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আমরা যেন কোনো সুদূব এবং দুর্গমের অভিযানে যাত্রা করিয়াছি।

কাঠগুদাম হইতে রওয়ানা হইবার সময়ে কুলির অনটন হেতু আমাদিগকে প্রায় সমস্ত দ্রব্যাদি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমরা রামগড়ে পৌঁছিবার ক্ষণকাল পরেই অবশিষ্ট দ্রব্যাদিসহ কুলি ঘোড়া ইত্যাদি সবই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পরদিন প্রাতে রামগড় হইতে যখন আমরা যাত্রা করিলাম তখন আটখানা ডাণ্ডি, একটি ডুলি, এক শত তিনটি কুলি, আটাশটা লাদ্দু ঘোড়া (Pack horse) ও গুটি-দুয়েক সওয়ারি ঘোড়া লইয়া আমাদের বিপুল বাহিনীটি পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ বাহিনীর সর্বাগ্রে চলিয়াছিল চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডি, তাহার পর বাসন্তী দেবীর, এবং তৎপরে আমার।

রামগড় ছাড়িয়া অল্প দূর আসিবার পর সহসা এক স্থানে দুই তিনটি পাহাড়ী বালক-বালিকা চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং প্রত্যেকে ফার্ন ও পাহাড়ী পুষ্পে রচিত এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছ চিত্তরঞ্জনকে উপহার দিয়া হাত পাতিয়া ডাণ্ডির সহিত চলিতে লাগিল।

বকশিশ দিতে হইবে।

কি ভাবিয়া চিত্তরঞ্জন একবার পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বোধকরি ললিতবাবুর সন্ধানে,—কিছু যদি ভাঙানো পয়সা পাওয়া যায়, হয়ত সেই উদ্দেশ্যে। ললিতবাবু কিন্তু বহু পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহার নাগাল পাওয়া সহজ ঠেকিল না। তখন চিত্তরঞ্জন নিজ ডাণ্ডিতে রক্ষিত অ্যাটাশি কেস খুলিয়া প্রত্যেককে একটি করিয়া রূপার টাকা উপহার দিতে লাগিলেন।

অর্থবান ব্যক্তিদের পাহাড়ের পথে যাতায়াত কালে পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা এই উপায়ে কিছু পয়সা উপার্জন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকলেই একটি করিয়া পয়সা দেয়, কদাচিৎ কেহ কখনও দেয় দুই পয়সা। চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে এক পয়সার স্থলে এক টাকা করিয়া পাইয়া ছেলেদের বিশ্বাসই হয় না যে, সত্যসত্যই একটি করিয়া টাকা তাহাদের অধিকারে আসিয়াছে। একবার হস্তস্থিত টাকার দিকে ও একবার চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে গভীর বিস্ময়ের সহিত রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে যখন সুনিশ্চিত প্রতীতি জন্মে সত্যই তাহারা এক টাকা করিয়া পাইয়াছে, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া দিকে দিকে ছুট দেয়। দেখিতে দেখিতে দাবাগ্নির মতো চতুর্দিকে বার্তা ছড়াইয়া পড়ে, 'কলকাত্তাকা রাজা আয়া হ্যায়'। পর্বত গাত্র হইতে গোটা তিন-চার ফুল ও কিছু ফার্ন ছিঁড়িয়া লইয়া লতাগুল্ম দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দলে-দলে ছেলে-মেয়ে উন্মত্ত লালসায় ছুটিতে থাকে চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির দিকে।

'রাজাজীকা জয়। রাজাজীকা জয়! রাজাজীকা জয়।'

কেহও দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দফা ফুল দিতেছে কি-না, বকশিস পাইয়া দ্রুতপদে পাকদণ্ডি পথে নামিয়া গিয়া পুনরায় বাহিনীর অগ্রভাগে সদর রাস্তার উপর নূতন পুষ্প হস্তে কেহও উঠিতেছে কি-না,—সে সকল দেখিবার অথবা সন্দেহ করিবার মতো বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি রাজাজীর ছিল বলিয়া মনে হইল না। নিঃশব্দে নিরাপত্তি সহকারে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া প্রসন্ন মুখে একটি করিয়া পুষ্পগুচ্ছ লইয়া তিনি এক-একটি টাকা দিতে লাগিলেন। পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা ডাণ্ডি যে-পরিমাণ সমৃদ্ধ হইতে লাগিল, রৌপ্য মুদ্রার দ্বারা অ্যাটাশি কেশ ঠিক সেই পরিমাণে রিক্ত হইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে মিনিট পনের কুড়িব মধ্যে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন টাকা উড়িয়া গেল।

আমার ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে একজন বলিল, "হুজুর, মেমসাহেবের ডাণ্ডি থেমে গেছে।" আমি বলিলাম, "কিছু বলবেন বোধহয়,—তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।" পর মুহূর্তেই আমার ডাণ্ডি বাসন্তী দেবীর নিশ্চল ডাণ্ডির পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বাসন্তী দেবী বলিলেন, "উপেনবাবু, সামলান আপনি ওঁকে! এই রকম টাকার বৃষ্টি চলতে থাকলে ওঁর অ্যাটাশি কেশ ত দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে যাবে। তারপর হাত পড়বে আমার অ্যাটাশি কেসে,—আর, তারপর আপনারটাতে। মায়াবতী পেঁ'াছে খুচরো খরচের জন্যে একটি টাকাও হাতে থাকবেনা।"

ব্যাঙ্ক, হাট-বাজার, দোকান-পশারের একান্ত অভাববশতঃ মায়াবতীতে নোট ভাঙানো অসুবিধাজনক ব্যাপার বলিয়া কিছু নগদ টাকা আমাদের সঙ্গে আনিবার জন্য গণেন মহারাজ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিলেন। তদনুসারে হাজার খানেক কাঁচা টাকা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অ্যাটাশি কেসের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় চলিয়াছিল।

পাহাড়ের পথে ঐ তিনটি অ্যাটাশি কেশ একত্রে না রাখিয়া আমাদের তিনখানা ডাণ্ডিতে চারাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বাসন্তী দেবীকে আশ্বস্ত করিয়া আমার ডাণ্ডিওয়ালা কুলিদিগকে বুঝাইলাম যে, যেরূপ প্রবল স্রোতে অর্থ নিঃশেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অচিরে তাহা বোধ করিতে না পারিলে তাহাদেরও সমূহ বিপদ। পারিশ্রমিকের টাকা ত সুদূরের কথা, 'বুতাতের' (খোরাকির) দু'চার টাকা পাওয়াও তাহাদেব পক্ষে কঠিন হইবে। এই বিপজ্জনক অবস্থা হইতে উদ্ধাব পাইবার উপায় হইতেছে, এই নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েদের হাত হইতে মুক্তি লাভ কবা। সুতরাং সকলের স্বার্থের অনুরোধে উর্দ্ধশ্বাসে দাও ছুট। 'যঃ পলায়তে স জীবতি' নীতি এখন সর্বতোভাবে অনুসরণীয়।

আমার কুলিদের মধ্যে একজন বলিল, "হুজুব, সুবিধেও আছে। সাম্‌নে অনেকখানি পথ মিঠা উৎবাই,—দৌড় দেওয়া চলবে।"

বলিলাম, "তবে আব কথা নেই, সর্বশক্তি সংহত ক'রে দাও দৌড়! কিন্তু তার আগে পিছনের ডাণ্ডিগুলোকে দৌড়ে সরিক হবার জন্যে কথাটা বুঝিয়ে দাও। আর, সাহেবের ডাণ্ডিব কুলিদেরকে বুঝিয়ে দিয়ো সাহেবের ডাণ্ডি ছাড়িযে যেতে-যেতে।"

ঠিক রণ-কৌশলেরই মতো এই গোপন অভিসন্ধিটুকু চক্ষের নিমেষে আমাদের বাহিনীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচাবিত হইয়া গেল। তাহার পর আকাশ-বাতাস পাহাড়-পর্বত কাঁপাইয়া আমার ডাণ্ডি-কুলিরা, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল কুলি চিৎকার করিয়া উঠিল, জয়! চণ্ডীমাঈ কী জয়! জয়! বরাই দেবী কী জয়! এবং তাহার পরই দৌড়! সবেগে চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডি অতিক্রম করিতে করিতে চাহিয়া দেখিলাম চিত্তরঞ্জনের মুখে গভীর বিস্ময়ের বিহ্বলতা। উপর দিকে মুখ নাড়িয়া নিঃশব্দে নির্বাক প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি? রেস? —না, আর—কিছু? উত্তর দিবার সময় পাইলাম না, দিলেও হয়ত

অসত্যভাষণ করিতে হইত ; চক্ষের নিমেষে নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেলাম।

পিছন দিকে তখন ছেলের দল 'রাজাজীকা জয়! রাজাজীকা জয়!' রবে দ্রুতবেগে আমাদের প্রতি ধাওয়া করিয়াছে ; আর, ললিতবাবু তাঁহার ডাণ্ডিতে অৰ্দ্ধদণ্ডায়মান-অর্ধোপবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিয়া উত্তেজিত হইয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চিৎকার করিতেছেন, 'হাটো। হাটো! হাটো! হাটো!'

চতুর্বাহকবাহিত ডাণ্ডির সহিত পাল্লা দেওয়া শক্ত, সুতরাং ছেলের দল ক্রমশ পিছাইয়া পড়িতেছিল। ইত্যবসরে আমাদের বাহিনীটি ছিন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিশীল হওয়ার দরুণ ডাণ্ডিগুলা বেশ-খানিকটা আগাইয়া চলিয়াছে, এবং অবশিষ্ট অংশ যথাসম্ভব গতি বৃদ্ধি করিয়া পিছনে অনুসরণ করিতেছে। চাহিয়া দেখি, ছেলেরা পিছাইয়া গিয়া বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগের লোকজনের নিকট কিছু আবেদন-নিবেদন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে ফললাভের কোনও সম্ভাবনা ছিলনা, কারণ, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার গাড়ির পিছনের অংশ মালগাড়ি,—তাহার রুদ্ধ লৌহ-দরজায় মাথা কুটিলেও একটি কণিকা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। অবিলম্বে এ কথা উপলব্ধি করিয়া ছেলের দল দাঁড়াইয়া পড়িয়া পলায়মান বাহিনীর প্রতি ক্ষণকাল নিরুপায় নৈরাশ্যে চাহিয়া রহিল, তাহার পর রণে ভঙ্গ দিয়া নিজেদের গ্রামের অভিমুখে ফিরিয়া গেল।

দানশীলতার যে মহিমময় নিঃস্রবটি কৌশলের, অথবা অপকৌশলের প্যাঁচ ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ডাণ্ডিতে বসিয়া মুগ্ধচিত্তে তাহার কথাই ভাবিতেছিলাম। যে অর্থ চিত্তরঞ্জন এইমাত্র দান করিলেন, তাহার পরিমাণ অবশ্য এমন কিছু অধিক নহে ; বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা। কিন্তু দানের মধ্যে পরিমাণের কথাটা তত বড় নহে, প্রবৃত্তির কথা যত বড়। ক্ষুধার্তকে ভিখারীর একমুষ্টি অন্নদানের

কাছে ধনবানের কত সহস্র টাকার দাম ম্লান হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের শ্রদ্ধাপূত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তির দিক হইতে বিচার করিলে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় দাতা কদাচিৎ দেখা যায়; আমি ত' আমার অভিজ্ঞতায় এমন আর একটি দেখি নাই। বৎসকে দেখিলে গাভীমাতার স্তনে দুগ্ধ যেমন আপনা-আপনি নামিয়া আসে, অভাব দেখিলে চিত্তরঞ্জনের মনে দানশীলতার প্রবৃত্তি ঠিক সেইরূপে স্বতঃক্ষরিত হইতে থাকিত।

ছেলেদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার কিছু পরেই সহসা একটি বৃহৎ নির্ঝরিণী আমাদের পথের সঙ্গিনী হইয়া পাশে পাশে বহিয়া চলিল। এত বড় ঝরণা অতি অল্পই দেখিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী বলিলেও বিশেষ দোষ হয়না। বহুক্ষণ ধরিয়া এই তন্বী স্রোতস্বিনীটি কৌতূক-পরায়ণা সহচরীর মতো বিচিত্র লীলায় আমাদিগকে পথশ্রান্তি হইতে অন্যমনস্ক রাখিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। কোথাও কুমারী কন্যার মতো কলকল্লোলা, কোথাও নববধূর মতো মৃদুভাষিণী, কোথাও যুবতীর মতো উচ্ছ্বাসময়ী, কোথাও কুপিতার মতো গর্জনকারিণী এবং কোথাও বা অভিমানিনীর মতো অবগুণ্ঠিতা। এই দূরে, এই নিকটে, এই পার্শ্বে, এই পশ্চাতে, এই সম্মুখে, এই অন্তরালে,—এইরূপে নানাভাবে আমাদের কৌতূক উৎপাদন করিতে করিতে সহসা এক সময়ে অপর একটি নির্ঝরিণীর সহিত মিলিত হইয়া অন্য পথে সরিয়া পড়িল। এই দুইটি নির্ঝরিণী মিলিয়া যেখানে ত্রিসঙ্গম হইয়াছে, তাহার উপর একটি সুদৃশ্য লৌহসেতু। সেই লৌহসেতুর উপর হইতে এই দুইটি গিরি-নির্ঝরিণীর অপূর্ব ক্রীড়া কিছুক্ষণ উপভোগ করিয়া আমরা গন্তব্য অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

অল্প পথ অতিক্রম করার পর সহসা এক সময়ে আমাদের চক্ষের সম্মুখে চিরতুষারের স্নিগ্ধ কমনীয় শোভা আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত

করিয়া অপরূপ মহিমায় প্রকাশিত হইল। পর্বতারোহণ করিতে করিতে তুষার এই প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িল ; এবং এখন হইতে আরম্ভ করিয়া মায়াবতী পেঁৗছান পর্যন্ত যতবার আমাদের বাম দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, অকপট বন্ধুর নির্মল হাস্যের মতো এই অমল ধবল তুষার শ্রেণী ততবারই আমাদিগকে নন্দিত করিয়াছে। লঘুপ্রকৃতি নির্ঝরিণীর মতো অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।

বেলা একটা আন্দাজ আমরা পিউড়ায় উপনীত হইলাম। সমুদ্রস্তর হইতে পিউড়ার উচ্চতা ৫৯০০ ফুট, এবং রামগড় হইতে দূরত্ব দশ মাইল। অর্থাৎ, দশ মাইল পথ পর্যায়ক্রমে আরোহণ অবরোহণ করিতে করিতে পিউড়ায় পেঁৗছিয়া আমরা দেখিলাম, রামগড় হইতে মোটের উপর একশত ফুট নিচে নামিয়াই আসিয়াছি।

পিউড়ার ডাকবাংলার সম্মুখের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্বাক হইয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে প্রায় আট-দশ মাইল জুড়িয়া গভীর গহ্বর; তাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উচ্চ পর্বতমালার গাত্রের একদিকে আলমোরা সহরের গৃহগুলি চিত্রাঙ্কিতের মতো দেখা যাইতেছে—এবং সেই পর্বতমালাকে অতিক্রম করিয়া পশ্চাতে বিচিত্র শৃঙ্গ-শিখর-চূড়াসমন্বিত তুষারগিরি গগন ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে মণ্ডিত এই দীর্ঘ এবং উচ্চ তুষারশ্রেণী একটি রূপার রাজ্যের মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। লেখনীর দ্বারা সে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে গেলে তাহার মহত্ত্বকে খর্ব করা হয়, তুলিকার দ্বারা আঁকিতে গেলে তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করা যায় না। আমার পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি কখনও পিউড়া হইয়া আলমোরা অঞ্চলে যাইবেন তাঁহার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, এই সুন্দর মধুর বিশাল পিউড়াকে অবহেলা না করিয়া অন্তত একদিনেরও জন্য ইহার সৌন্দর্যরসধারায় স্নাত হইয়া তৃপ্ত হইয়া যাইবেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে আলমোরায় পেঁৗছাইবার আমাদের সঙ্কল্প ছিল,—কিন্তু সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একদিন পিউড়ার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য সকলেই একমত হইলাম।

বাংলার প্রাঙ্গণে এবং চতুর্দিকে সুদৃঢ় চিড় বৃক্ষের শ্রেণী। চিড়

গাছের বাংলা নাম কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষায় ইহার কি নাম তাহাও অবগত নহি। ইহার ইংরাজি নাম পাইন; কিন্তু পাইন্ বলিতে যে দেবদারু অথবা দেওদার বৃক্ষ বুঝায় ইহা তাহাও নহে। দেবদারু গাছ নিম্ন সমতল ভূমিতে যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু পাহাড় ভিন্ন চিড় আর কোথাও দেখা যায় না। তাহাও পাহাড়ের নিম্ন প্রদেশে নহে, বেশ খানিকটা উচ্চে উঠিলে তবে। পাইন্ বোধকরি শ্রেণী নাম, যাহার মধ্যে দেবদারু এবং চিড় উভয়েই পড়ে। এই পাইন্ গাছের হাওয়া যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। আলমোরায় এবং আলমোরা অঞ্চলে পাইন বৃক্ষের সংখ্যা খুব বেশী। আলমোরায় যে অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় যক্ষ্মা রোগী আসিয়া বাস করে, তাহার প্রধানতম কারণ বোধহয় এই পাইন্ বৃক্ষের আধিক্য। পাইন গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছাইয়া বসিয়া আমরা প্রকৃতির মধুর লীলা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

ক্ষণকাল্ পরে এক বিকট আর্তনাদে আমরা চকিত হইয়া উঠিলাম। ডাক বাংলার সংলগ্ন একটি ডাকঘর ও মুদিখানা আছে, সেই দিক হইতে এই আর্তনাদ আসিতেছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য উৎসুক চিত্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমাদের কৌতূহল দশগুণ বাড়িয়া উঠিল। একটি কুড়ি-একুশ বর্ষীয় যুবককে ধরিয়া কয়েকটি লোক ইচ্ছানুরূপ প্রহার করিতেছে, এবং সেই বলিষ্ঠ এবং সবল যুবকটি প্রহারের অনুপাতে দশগুণ চীৎকার করিতেছে। তাহার তারস্বর পর্বত হইতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইয়া একটা বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। অদূরে একটি ষোল-সতের বৎসর বয়সের বালিকা হস্তমধ্যে মুখাবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া। এই ভীষণ এবং মধুর নাটকীয় দৃশ্যের রহস্যোদ্ঘাটন করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, সেই বলিষ্ঠ এবং পুষ্ট যুবকটি তাহার আকৃতির হিসাবে চোরও নহে, ডাকাতও নহে, গুণ্ডাও নহে; সে

নিতান্তই একটি নিরীহ প্রেমিক ; এবং সেই করমুখাবৃতা ব্রীড়াবগুণ্ঠিতা অনুতাপমজ্জিতা কিশোরীটি তাহার উপাস্য বস্তু। উভয়ের মধ্যে পরাক্রান্ত প্রেম যখন দুর্মদ বিক্রমে সংযমের কঠিন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে, প্রেমের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে প্রণয়পথের এই দুইটি রসিক পথিক গুপ্তপথ অবলম্বন করিয়া গ্রামান্তরে গিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়। কিন্তু এই রসবোধবর্জিত কঠোর সংসারে দুর্জনের অভাব নাই, সেই কারণে নিশ্চিন্ত হইবারও উপায় নাই। গ্রামের কয়েকটি পরসুখকাতর হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি মিলিয়া প্রণয়ের নিভৃত নিকুঞ্জ মথিত করিয়া এই প্রেমিক যুগলকে ধরিয়া আনিয়াছে,—এবং পঞ্চায়েতের দরবারে তাহাদিগকে উপস্থাপিত করিয়া বিচারের পূর্বেই শাস্তি দিতেছে। এমন আপাতকরুণ এবং কঠোর দৃশ্যের মধ্যে কৌতুকেরও একটি যে ফল্গুধারা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। এই অদূরদর্শী প্রেমিকটি ধারণা করিতে পারে নাই যে, অমন সরস রোমান্সের অব্যবহিত পিছনে এমন একটি দেহপীড়নকর পরিণতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তেমন দূরদর্শিতা থাকিলে গ্রামান্তরের গুপ্তপথ অবলম্বন না করিয়া সে হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথই অবলম্বন করিত। আমাদের উপস্থিতির কল্যাণে বেচারী প্রেমিক ঈর্ষাপীড়িত দুর্বৃত্তদের নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া পঞ্চায়েতের মোড়ল মহাশয় হাতমুখ নাড়িয়া বিশদভাবে বক্তৃতা এবং ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। সেই বক্তৃতার দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিবারও কতকটা অভিপ্রায় হয়ত ছিল, কিন্তু পাহাড়ি হিন্দীর ষোল-আনা মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমরা আমাদের পূর্বস্থলে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি সেই রূপার রাজ্য অস্তমান সূর্যের কিরণে মণ্ডিত হইয়া কখন অকস্মাৎ সোনার রাজ্যে পরিণত হইয়াছে! বিমুগ্ধ হইয়া আমরা সেই তুলনাহীন সৌন্দর্যের ধারা পান করিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত আলোকের বিচিত্র সজ্জাতে যেন নব নব রাজ্য

গড়িয়া উঠিতে লাগিল। রঙের সহিত রেখাও যেন নূতন নূতন নক্সায় বদলাইতেছে। কখনো পীত, কখনো পীতাভ, কখনো রক্তিম, কখনো রক্তাভ, কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও স্নিগ্ধ। এইরূপে এক ঘণ্টা ধরিয়া আমরা বিধাতার অপূর্ব পরিবর্তনশীল জীবন্ত 'চিত্র নিরীক্ষণ করিলাম। তাহার পর সেই উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি ক্রমশ পীত হইতে ধূসরে পরিবর্তিত হইয়া অন্ধকারের রাজ্যে মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে আমরা মনের মধ্যে সেই অপরূপ অভিজ্ঞতার চিত্র অঙ্কিত ও বহন করিয়া ডাকবাংলোয় উঠিয়া আসিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে চা-পান সারিয়া সুন্দরী কমনীয় পিউড়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা আলমোরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সদ্য বিচ্ছেদকাতর মনের মধ্যে গুন্ গুন্ রবে একটা অস্ফুট গীতি ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল,

হে প্রিয়া পিউড়া, অয়ি নিরুপমে,
তোমারে ছাড়িয়া চলিনু তবে।
তোমার রূপের অপরূপ ছবি
জানিনা আবার হেরিব কবে!

২২

পিউড়া হইতে আলমোরার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। এই আট মাইল পথ অতিক্রম করিতে আমাদের অধিক সময় লাগিল না। কারণ প্রথমতঃ, পিউড়া হইতে আলমোরার পথে কোনো জায়গায় তেমন-বেশি চড়াই অথবা উৎরাই নাই, যাহাতে পথ চলায় বিলম্ব ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাসন্ন হেমন্তের স্নিগ্ধ শীতল প্রভাতে কুলিগণ ইচ্ছা করিয়াই দ্রুত চলিয়াছিল।

পিউড়া-আলমোরা পথের সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ সবুজ রঙের সুদৃশ্য পাইন বৃক্ষের শ্রেণী। দক্ষিণে ও বামে যতগুলি পর্বত আমরা অতিক্রম করিয়া আসিলাম প্রায় সবগুলিই পাইন বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত। কোনও পাহাড়ে অতি-পুরাতন বৃক্ষসকল বহু উর্ধ্বে গগন ভেদ করিয়া ঋজু হইয়া দণ্ডায়মান, কোনোটিতে তরুণ বৃক্ষরাজি প্রভাত সূর্যকিরণে যৌবন-স্বপ্ন দেখিতেছে, এবং কোনোটিতে বা পাইন-শিশুগণ অচিরকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া বায়ু-হিল্লোলে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া খেলা করিতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, অধিকাংশ পাইন গাছের পাদদেশে খানিকটা স্থান কাটিয়া দিয়া তাহার মুখে, আমাদের দেশে খেজুর গাছে যেমন ভাঁড় বাঁধা হয়, তেমনি ভাবে একটি করিয়া ভাঁড় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব ছিন্ন স্থল হইতে এক প্রকার গাঢ় নির্যাস ক্ষরিত হইয়া ভাঁড় পূর্ণ হইয়া যায়। পরে বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে এই নির্যাসকে তরলিত ও পরিস্রুত করিয়া তারপিন তৈল প্রস্তুত হয়।

এই সকল পাইন বনের অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংরক্ষিত অরণ্য। এই অরণ্যের অন্তর্গত বৃক্ষের কোনও প্রকার ক্ষতি করিলে আইন অনুসারে তাহার দণ্ডবিধান আছে। অনেক স্থলে আগুন জ্বালা এমন কি চুরুট খাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সকল অরণ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বহুসংখ্যক প্রহরী

আছে ; ইহারা সর্বদা অরণ্যে পাহারা দেয়, এবং কোনও লোককে আইন বিরুদ্ধ কোনও কার্য করিতে দেখিলে পুলিশে ধরিয়া লইযা যায়। এই প্রহরিগণকে প্যাট্রোল বলে। ডাণ্ডিওয়ালাগণ ও কুলিগণ এই প্যাট্রোলগণের ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত।

বেলা দশটা আন্দাজ আলমোরা সহরের উপকণ্ঠে পেঁাছিলাম। তথায় দেখিলাম, একজন পাহাড়ী হস্ত ও মুখের সাহায্যে একটি বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিযাছে। দেখিতে যন্ত্রটি নিতান্তই সামান্য, এবং যন্ত্র হইতে যে শব্দ নির্গত হইতেছিল তাহাও অতিশয় ক্ষীণ। কিন্তু দেশকালপাত্রের মাহাত্ম্যে কি-না বলিতে পারি না, সেই অকিঞ্চিৎকর যন্ত্র হইতে একটি সংক্ষিপ্ত পাহাড়ী গতের রূপে অপূর্ব-মধুর স্বরলহরী নির্গত হইযা আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। প্যাহড়ীটিও পদব্রজে আলমোরার অভিমুখেই চলিয়াছিল ; কিন্তু আমরা ডাণ্ডিতে দ্রুতগতিতে চলিযাছিলাম বলিয়া অবিলম্বে তাহাকে ও তাহার সুমিষ্ট স্বরলহরীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে প্রবল বাসনা হইতেছিল, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তাহার বাজনা একটু শুনি।

আলমোরায় প্রবেশ করিয়া ডাকবাংলোয় পেঁাছানো পর্যন্ত সহরের যেটুকু অংশ অতিক্রম করিলাম, দেখিলাম অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সজ্জিত। এত অধিক পরিচ্ছন্ন যে, মনে হইল আর একটু অপরিচ্ছন্ন হইলে যেন স্বস্তি কিছু বাড়িত। পথে জঞ্জাল নাই, ধূলি-কাদা নাই,—এমন কি কোথাও একটা কাগজের টুকরা পর্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। পথপার্শ্বে ক্রোটন্ গাছগুলি এমন পরিপাটি করিয়া ছাঁটা, ও ফুলের গাছগুলি এমন সাজাইয়া-মানাইয়া বসানো যে, ড্রয়িং রুমের মধ্যে সেগুলিকে স্থাপন করিলেও ত্রুটি বাহির করিবার উপায় থাকে না। গৃহ ও গৃহের অঙ্গনগুলি এমন ঝাড়া-পোঁছা তক্‌তকে-ঝক্‌ঝকে যে, দেখিয়া মনে হয় সেগুলি যেন ব্যবহারের জন্য নহে, শুধু শোভার উদ্দেশ্যে সাজাইয়া

রাখা হইয়াছে। পথে গাড়িঘোড়া নাই, জীবজন্তু নাই, এমন কি লোকজনও অতিশয় বিরল। অধিকাংশ গৃহ সযত্ননিরুদ্ধ। গৃহবাসিগণ বোধহয় নিম্নে নামিয়া গিয়া থাকিবে।

এই নিখুঁৎ পরিচ্ছন্ন এবং কতকটা নির্জন নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের মধ্যে নির্মল আনন্দ এবং আরাম পাওয়া গেল না। এরূপ কায়দাদোরস্ত ঠিকঠাকের মধ্যে নিজেকে অবস্থিত করিলে মন যেন সময়ে সময়ে হাঁপাইয়া উঠে;—মনে হয় এই অখণ্ড যথাযথতার সহিত নিজের সহজ অভ্যাস ও অবিন্যস্ত প্রকৃতিকে কোনমতে খাপ খাওয়ানো যাইবে না! ইহার মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ ভাবে আশ্রয় পাওয়ার পরিবর্তে বেখাপ্পা ভাবে ইতস্ততঃ খট্‌খট্‌ করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেই হইবে। অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের প্রকৃতিকে এমন অপরিবর্ত-নীয় রূপে গড়িয়া তুলি যে, কোনো প্রকার ব্যতিক্রমেই আমরা স্বস্তিবোধ করি না।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একদল মেছুনী কোনো দূর গ্রামে মাছ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময়ে পথে সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় এক গ্রামের জমিদার-গৃহে যাইয়া তাহারা রাত্রির মতো আশ্রয় ভিক্ষা করে। দয়াপরবশ হইয়া জমিদার তাঁহার বহির্বাটীর বারান্দায় তাহাদিগকে নিশাযাপন করিবার অনুমতি দেন। আহারাদি সমাপন করিয়া মেছুনীগণ বারান্দায় শয়ন করিল। বারান্দায় টবের উপর বসানো অনেকগুলি সুগন্ধি পুষ্পের গাছ ছিল। ফাল্গুন মাস; মৃদু-মন্দ দক্ষিণা বায়ুর কল্যাণে মুক্তিলাভ করিয়া ফুলের গন্ধ সমস্ত বারান্দাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মেছুনীগণের কিন্তু ভারি বিপদ হইল, কিছুতেই আর ঘুম আসে না! যতই তাহারা ঘুমাইবার চেষ্টা করে, ফুলের মিষ্ট গন্ধে কিরূপ অস্বস্তি বোধ হইয়া চটকা ভাঙ্গিয়া যায়। সহসা তাহাদের ইহার এক প্রতীকার মনে পড়িল। তাহাদের মাছের চুবড়িতে যে-সকল মাছের ন্যাকড়া ছিল, সেইগুলা বাহির করিয়া নিজ

নিজ নাসিকার নিকট রাখিয়া শয়ন করিল। তখন আর কোন উপদ্রব রহিল না ; তীব্র আমিষ গন্ধের ভিতর পুষ্পের মৃদু সৌরভ ডুবিয়া মরিল ; এবং পরিচিত প্রিয় গন্ধে আরাম পাইয়া মেছুনীগণ অনতিবিলম্বে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল।

মৎস্যের গন্ধ অপেক্ষা পুষ্পসৌরভ যে মনোরম বস্তু, সে কথা মেছুনীগণ অস্বীকার করে না। কিন্তু পুষ্প-পরমাণু তাহাদের প্রশংসা অর্জন করিলেও মৎস্য-পরমাণু তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ করে।

এ বিষয়ে শুধু মেছুনীদের দোষ দিলেই চলিবে না। আমি আমার মলিন ছিন্ন শয্যায় শুইয়া যত শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ি, রাজপ্রাসাদের দুগ্ধফেন-শুভ্র মূল্যবান শয্যায় শুইয়া তত শীঘ্র পড়ি না। বহুব্যবহৃত পুরাতন জুতা ফেলিয়া অপরের দামি জুতা পায়ে দিলে পায়ের শোভা বাড়ে বটে, কিন্তু আরাম কমে। বাল্যকালে অনভ্যস্ত নূতন জুতার জন্য পায়ে অনেক সময়ে ফোস্কা পড়িয়াছে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এ সত্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ জীবনে আমাদের অনেকবারই ঘটিয়া থাকে। ঠিক এই কারণেই, মানুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া সুখ হয়ত পায়, কিন্তু স্বস্তি তেমন পায় না।

আলমোরায় দুইটি ডাকবাংলা পাশাপাশি সংলগ্ন। তন্মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত এবং প্রশস্ত, সেইটিই আমরা অধিকার করিলাম।

আলমোরা হইতে মায়াবতীর পথে যাইবার জন্য পুনরায় ডাণ্ডি, ঘোড়া, ডাণ্ডির কুলি, ভারবাহী কুলি প্রভৃতির নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত আমাদের সহিত যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা এখান হইতে কাঠগুদাম ফিরিয়া যাইবে। আমাদের পেঁীছিবার কিছুক্ষণ পরেই একটি স্থানীয় ভদ্রলোক ডাকবাংলায় আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁনি এখানকার একটি বড় দোকানের সত্ত্বাধিকারী এবং অদ্বৈত-আশ্রম কর্তৃপক্ষের উপকারী বন্ধু। আমাদের মায়াবতী যাত্রার

সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিবার জন্য অদ্বৈত-আশ্রম ইঁহার উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সন্ধান লইয়া ইনি প্রস্থান করিলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আহারাদি সারিয়া অপরাহ্নে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

আলমোরা সহর আলমোরা জেলার সদর স্টেশন। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি স্কুল, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত, প্রথম শ্রেণীর একটি ডাকঘর, সরকারি হাসপাতাল এবং একটি গুর্খা সেনানিবাস আছে। একটি জেলার সদর মহকুমা হইলেও শিমলা, দার্জিলিং, এমন কি নৈনিতালের তুলনায় আলমোরা নিতান্ত সামান্য। ইউরোপীয়দের কোনও দোকান দেখিতে পাইলাম না। দেশী লোকের দুই তিনটি মধ্যম শ্রেণীর দোকান দেখিলাম। আলমোরা বাজারটি অবশ্য নিতান্ত মন্দ নহে। নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে আলমোরার পথে পথে এবং বাজারে অনির্দিষ্ট ভাবে বেশ খানিকটা ঘুরিয়া ক্লান্তিবোধ হইলে আমরা ডাকবাংলায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে তিনজন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা আমাদেরই উদ্দেশ্যে ডাকবাংলায় যাইতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন আমাদের পূর্বপরিচিত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। পূজার ছুটির অব্যবহিত পূর্বে ইনি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মায়াবতী যাত্রা সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির করিবার জন্য ভাগলপুর গিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদের মায়াবতী যাত্রার সংবাদ পাইয়া তত্ত্বাবধায়ক হইয়া আমাদিগকে মায়াবতী লইয়া যাইবার জন্য শিমলা শৈল হইতে আসিতেছেন। কাঠগুদামেই আমাদের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈবযোগে বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় একদিন পরে কাঠগুদামে উপস্থিত হন। তথায় আমাদের আলমোরা হইয়া আসিবার কথা অবগত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতগতিতে আসিয়া সেই দিন বৈকালে আলমোরা পৌঁছিয়াছেন। ইঁহার সঙ্গীদ্বয়ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত।

আলমোরায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছিল, ইঁহারা তাহারই তত্বাবধানে আলমোরায় বাস করিতেছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। উগ্র গৌরবর্ণ দেহ, তীক্ষ্ণ প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী, গৈরিকবাস পরিহিত তরুণ যুবাপুরুষ, মাথায় রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচায়ক টুপি। ইঁহার নাম মহেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, পূর্ব পরিচয়ে ফ্র্যান্সিস্ জন আলেকজাণ্ডার। ইনি একজন আমেরিকানিবাসী কোটিপতির পুত্র,—রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিশনে যোগদান করিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, এবং পরদিন প্রত্যুষে তিনি যখন পুনরায় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকবাংলায় আসিলেন, তখন কতকটা স্থির হইয়া গেল যে, আমাদের মায়াবতী পেঁছানোর কয়েক দিন পরে তিনি তথায় গিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, মহেশ্বরানন্দের গৃহাশ্রমের নাম ফ্রান্সিস্ জন আলেকজাণ্ডার। ইংরাজিতে ফ্র্যান্সিসের (Francis) সংক্ষিপ্ত প্রতিশব্দ ফ্র্যাঙ্ক (Frank)। আমরা যেমন হীরনকে হীরু বলিয়া ডাকি, ওরা তেমনি Francisকে Frank বলিয়া ডাকে। গণেন মহারাজ ফ্র্যান্সিসকে সম্বোধন করিবার সময়ে ফ্র্যাঙ্ক বলিয়া ডাকেন। আমরাও তাঁর দেখাদেখি ফ্র্যাঙ্ক বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম।

ফ্র্যাঙ্ককে আমার ভারি ভাল লাগিল,—সম্ভবতঃ তাহার উন্মুক্ত-উচ্ছল প্রকৃতিরই জন্য। গৈরিক বসন তাহার চপলতাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই, বরং একটু মধুর ভাবে রঙিনই করিয়াছে। সে যখন হাসে,—আর, কথায় কথায়ই সে হাসে,—তখন তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার মনে হইল, রামকৃষ্ণ মিশন বেশিদিন এই চপল-মধুর প্রকৃতির মানুষটিকে নিজের বেষ্টনীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। যে ঔৎসুক্য অথবা খেয়ালের বশবর্তী

হইয়া সে সহসা একদিন সংসার ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই খেয়ালেই অকস্মাৎ একদিন তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে। ফ্র্যাঙ্কের পক্ষে সাধুপুরুষ হওয়া যত সহজ, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া তত নহে।

ব্রহ্মচারিগণ বিদায় গ্রহণ করিলে আমরা আলমোরার বাজারে গিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় এবং অনেকগুলি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিলাম। দ্রব্যের সংখ্যা এবং ওজন ক্রমশঃ বাড়িয়া একটি কুলির সহায়তা অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছিল। আমাদের বাহিরের অবস্থা এবং অন্তরের বাসনার মধ্যে যে একটা নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছিল, একটি চতুর কুলি বোধহয় আমাদের কাছে কাছে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। এক সময়ে সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী কুলি চাই ?" মুখে তার মৃদু-মধুর হাসি।

কহিলাম, "কুলি ত' চাই ; কিন্তু তোমাকে কোথায় দেখেছি বল ত ? তোমার মুখ যে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে।"

কুলি হাসিয়া কহিল, "কাল আপনারা যখন আসছিলেন, তখন আমি আপনাদের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে চলেছিলাম।"

তাইত' বটে। এ ত' ঠিক সেই বাজনা-বাজানো লোকটিই। সেই বিচিত্র বাজনাটি ভাল করিয়া দেখিবার ও শুনিবার জন্য মনের মধ্যে একটু আগ্রহ ছিল। দৈব যে এমন করিয়া তাহাকে পুনর্বার জুটাইয়া দিবে, তাহা জানিতাম না। কহিলাম, "তোমার সে বাজনাটি কোথায় ?"

সে তাহার জামার পকেট হইতে যন্ত্রটি বাহির করিয়া দেখাইল। ত্রিশূল-আকার একটি লোহার ফলক, তাহাতে একটি সূতা বাঁধা ; দাঁতের মধ্যে সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া হস্তের সাহায্যে বাজাইতে হয়। যন্ত্রটি ত' মাত্র এই পর্যন্ত, কিন্তু বাজাইবার কৌশলে অপ্রত্যাশিত স্বরলহরী সৃষ্টি করে।

দ্রব্য বহন করিবার জন্য অপর একটি কুলি নিযুক্ত করিয়া আমরা তাহাকে বলিলাম, "তোমাকে মোট বইতে হবে না, বাজনা বাজিয়ে চল, বকশিস পাবে!"

সে বাজনা বাজাইল বটে, কিন্তু মোট বহিতেও ছাড়িল না,—ডাকবাংলা পর্যন্ত আমাদের মোট বহন করিয়া আনিল। মোট বহন করা তাহার পেশা, তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে অগৌরব নাই; কিন্তু যে জিনিষ একান্তই তাহার চিত্তবিনোদনের বস্তু, তাহাকে উদরান্নের সংস্থানের সহিত জড়িত করিয়া অপমানিত করিতে পারেনা।

২৩

আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বেলা একটার পর পরবর্তী ডাকবাংলা লমগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। লমগড় আলমোরা হইতে দশ মাইল দূর। এখান হইতে আমাদের প্রায় সকল ব্যবস্থাই নূতন করিয়া করিতে হইল। মায়াবতীতে প্রয়োজনের মতো সংখ্যায় ডাণ্ডি পাওয়া না যাইতে পারে সেই আশঙ্কায় একেবারে আটখানা ডাণ্ডি এক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া লওয়া হইল। মায়াবতী হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়েও এই ডাণ্ডিগুলি আমাদের কাজে লাগিবে।

ডাণ্ডিওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলি সম্বন্ধে কিন্তু এখান হইতে নিয়ম একেবারে স্বতন্ত্র। কুলি-এজেন্সির কুলি লইলে প্রত্যেক স্টেজে কুলি বদল করিতে হয়। অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া এই সকল কুলিকে এক স্টেজের অধিক লইয়া যাওয়া যায় না। অথচ কুলি-এজেন্সি ভিন্ন উপায়ান্তরও নাই। বহু কষ্টে আমরা মাত্র বার-তেরটি কুলি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম, যাহারা বরাবর মায়াবতী পর্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইল। অবশিষ্ট সমস্ত কুলি কুলি-এজেন্সির। ইহারা পরবর্তী স্টেজে পঁহুছিয়া খালাস,—তাহার পর এক পদও অগ্রসর হইবে না। সেখান হইতে পুনরায় নূতন দল সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য সংগ্রহ করিবার ভার এজেন্সির উপর। আলমোরা হইতে আমাদের রওয়ানা হইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া এজেন্সির দুইজন চাপরাশি লমগড় চলিয়া গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় পাটওয়ারির সাহায্যে তাহারা নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ হইতে আমাদের জন্য যথাসম্ভব কুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

ডাকবাংলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া খানিকটা যাওয়ার পর আমরা আলমোরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কুলি, ডাণ্ডি ও ঘোড়ার পদশব্দে বাজারের পাথর বাঁধানো রাজপথ চকিত হইয়া উঠিল।

পিচ্ছিল পাথরের উপর ঘোড়ার পা ক্ষণে ক্ষণে পিছলাইতেছিল। তাহার হড়াৎ-হড়াৎ শব্দের মধ্যেও একটা অভিনবত্বের সৃষ্টি। পথের দুই পার্শ্বে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের, এবং দ্বিতলে প্রকোষ্ঠের গবাক্ষপথে চকিতনয়না কামিনীগণের কৌতুক ও কৌতূহল সঞ্চার করিতে করিতে আমাদের এই বিচিত্র বৃহৎ দলটি বাজারের সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। বাজার ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকের পর্বতের গাত্র দিয়া প্রথম এক মাইল পথ আমরা শুধু নামিয়া গেলাম। তথায় লৌহ-সেতুর সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী পার হইয়া পুনরায় চড়াই আরম্ভ হইল।

কাঠগুদাম হইতে আলমোরা পর্যন্ত পথ ভালই ছিল। কিন্তু এখন হইতে আরম্ভ হইল বন্ধুর ও দুর্গম পার্বত্য পথ। ইহার পূর্ব পর্যন্ত, পার্বত্য পথ বলিতে প্রকৃত পক্ষে যাহা বুঝায়, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের তেমন-কিছু ছিল না। কিন্তু ক্লেশ এবং আশঙ্কার সহিত সেই কঠিন পার্বত্য পথ অতিক্রম করার যে উদ্দীপনা এবং আনন্দ, তাহার অভিজ্ঞতাও ছিল না। পথ যতই দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল আমাদের উৎসাহ ও উত্তেজনাও ততই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে পথ বলিতে অভিধানে যাহা বুঝায় তাহা যখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল, তখন আমরা ডাণ্ডি হইতে নামিয়া পড়িয়া সেই 'কুটিল কুপথ ধরিয়া' উৎসাহ ভরে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। কোথাও চড়াই, কোথাও নাবাই, কোথাও পিচ্ছিল; কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও নিবিড় অরণ্যমণ্ডিত, কখনো বা উদার উন্মুক্ত। অস্তমান সূর্য্যের কিরণ-বহ্নির মধ্যে তুষারশিখর তরল স্বর্ণের মতো উজ্জল হইয়া জ্বলিতেছিল, এবং আকাশের বিস্তৃত অঙ্গনে সেই স্বর্ণ-কিরণ পশ্চিম হইতে পূর্বে ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণাভ বর্ণে পরিণত হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দিনের আলো মিলাইয়া গিয়া শুক্লা পঞ্চমীর অনুজ্জল জ্যোৎস্না কিরণে চতুর্দিক স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় অস্পষ্ট ও মনোরম হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা লমগড়ের ডাকবাংলায় উপনীত হইলাম। আলমোরা হইতে লমগড়ের দূরত্ব দশ মাইল, এবং সমুদ্র-স্তর হইতে উচ্চতা ৬৪৫০ ফুট।

এখানকার ডাকবাংলাটি পূর্বেকার ডাকবাংলাগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সুনির্মিত। কাঠগুদাম হইতে পিউড়া পর্যন্ত প্রত্যেক ডাকবাংলায় তিনটি করিয়া, এবং আলমোরার ডাকবাংলা দুটিতে চারখানি করিয়া শয়ন-কক্ষ ছিল। কিন্তু লমগড় এবং তৎপরবর্তী ডাকবাংলাগুলিতে দুইটি করিয়া শুইবার ঘর। আলমোরার পর এ পথে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া এ দিকে ডাকবাংলাগুলি বড় করিয়া করিবার কোনো প্রয়োজন হয় নাই।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার পূর্বেই চিকিৎসকের কঠিন কর্তব্য পুনরায় আমাদের স্কন্ধের উপর চাপিয়া বসিল। দেখিলাম, চার পাঁচজন লোক বড় বড় পাত্র হস্তে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল তাহারা পীড়িত, ঔষধ লইতে আসিয়াছে। এবার কেবল ডাণ্ডিওয়ালা অথবা ভারবাহী কুলিই নহে, রোগিগণের মধ্যে দুই-তিনজন স্থানীয় অধিবাসীও ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল স্বয়ং বাংলারক্ষকের নিকট আত্মীয়। রোগও এবার একপ্রকার নহে। কাহারও মস্তিষ্কের পীড়া, কাহারও জ্বর, কাহারও বা পেটের পীড়া। চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর এবং অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া এতগুলি লোকের বিশ্বাস দেখিয়া মনের মধ্যে সগর্ব আনন্দ অনুভব করা গেল।

কিন্তু এই অনায়াসলব্ধ পসার কি প্রকারে বজায় রাখিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে উৎকণ্ঠাও কম ছিল না। বিভিন্ন রোগীগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়া ঔষধ নিরূপণ করা গেল। যাহাদের জ্বর

অথবা জ্বরভাব, তাহাদিগকে একোনাইট দিতে হইবে; যাহাদের মস্তকের পীড়া এবং মাথাধরা, তাহাদিগকে বেলেডোনা; এবং যাহাদের পেটের অসুখ, তাহাদিগকে পলসাটিলা।

ঔষধ অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র বেলেডোনা ভিন্ন অপর ঔষধগুলির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। সারাদিনের পরিশ্রান্তির পর বিরাট সামগ্রীস্তূপের মধ্য হইতে ঔষধ খুঁজিয়া বাহির করিবার মতো কাহারো ধৈর্য অথবা সামর্থ্যও ছিলনা। অথচ রোগিগণের সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধ অতিক্রম করিবার কোনো উপায় ছিল বলিয়াও একেবারেই মনে হইতেছিল না। তখন নিরুপায় হইয়া বেলেডোনা ঔষধের সর্বরোগহর অত্যাশ্চর্য গুণের কথা স্বীকার করিয়া প্রত্যেককেই একফোঁটা করিয়া বেলেডোনা প্রয়োগ করা গেল। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বে উদরাময়ের মহৌষধ রূপে বেলেডোনার কোনও উল্লেখ বোধহয় নাই। কিন্তু বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথগণ এ বিষয়ে একবার যত্ন পূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন; আমাদের মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল এক-এক ফোঁটা বেলেডোনা সেবন করিয়া দুইটি উদারাময়ের রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিকে যিনি অবিশ্বাসী তিনি হয়ত বলিবেন, 'হোমিওপ্যাথি যে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ ঘটনা তাহারই অকাট্য প্রমাণ।'

বিশ্বাসী বলিবেন, 'বিশ্বাস হোমিওপ্যাথি নহে। মাতৃক্রোড়ে অস্ফুটবাক্ অজ্ঞান শিশু, রোগ শয্যায় জ্ঞানশূন্য প্রলাপযুক্ত রোগী, তৃণাহারী গো-অশ্বাদি পশুগণ, সকলেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে। বেলেডোনা খাইয়া উদারাময়ের রোগী আরোগ্য লাভ করিল, ইহা সত্য হইলেও, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় না যে, প্রদাহজনিত রোগে বেলেডোনা কার্যকারী নহে। অতএব, বেলেডোনার যে-সকল গুণ

প্রতিষ্ঠিত এবং নির্মাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেও এ ঘটনার দ্বারা বেলেডোনা বঞ্চিত হইল না।"

এই সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়েই গল্পটি শুনিয়া পুলকিত হইবেন। তবে, গল্পটি কাহার পক্ষ সমর্থন করিবে, সে নিষ্পত্তি তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইবেন।

মোহিনীমোহন ঘোষ নামে ভাগলপুরের একজন খ্যাতনামা অ্যালোপ্যাথিক্ ডাক্তার কোনো রোগীকে পুরিয়া করিয়া পাউডারে ঔষধ দিয়াছিলেন। ঔষধ সেবন করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছুদিন পরে উক্ত রোগী পুনরায় সেই একই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর আত্মীয় পুনরায় মোহিনীবাবুর নিকট হইতে ঔষধ লইতে আসে। একবার বিশেষ উপকার হইয়াছিল বলিয়া মোহিনীবাবু দ্বিতীয় বারও প্রথম বারের ঔষধই দিলেন। এবার কিন্তু তেমন উপকার হইল না।

রোগীর আত্মীয় মোহিনীবাবুর নিকট আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "হুজুর, পহলে দফে আপ যো লাল দবাই দিয়ে থেঁ, উস্‌মে বহুৎ ফায়দা থা। অব্‌ বি যো সব্‌জা দবাই দিয়া গিয়া, উস্‌মে ওৎনা ফায়দা নহি হুয়া। মেহেরবানি করকে পহলে দফেকা লালহি দবাই দিয়া যায়।" অর্থাৎ, হুজুর প্রথম বারে যে লাল ঔষধ দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ উপকার হয়েছিল। এবার যে সবুজ ঔষধ দিয়েছেন, তাতে তত উপকার হয় নি। অনুগ্রহ ক'রে লাল ওষুধই দেওয়া হোক্।

মোহিনীবাবু ত' লাল-সবুজের কোনো কূল-কিনারাই পান না। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন বহিতে যে ঔষধ লিখিত আছে, তাহা ত' খড়ির ন্যায় সাদা হইবার কথা। তবে লাল ঔষধ সবুজ ঔষধ কি বলিতেছে লোকটা।

অদূরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে কম্পাউণ্ডারবাবু লাল-সবুজের আলোচনা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, লোকটি সম্ভবতঃ মোড়কের কাগজের রঙের কথা বলিতেছে। প্রথম বার হয়ত' লাল

কাগজের মোড়কে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে সবুজ কাগজের মোড়কে। তাঁর অনুমানটা তিনি সঙ্কেতে মোহিনীবাবুকে জানাইয়া দিলেন।

মৃদু হাসিয়া প্রেস্‌ক্রিপশন্‌ লিখিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে লাল ওষুধই দিলাম।"

লাল কাগজে মোড়া ঔষধ লইয়া খুসি হইয়া রোগীর আত্মীয় প্রস্থান করিল, এবং এবার ঔষধ সেবন মাত্র রোগী সারিয়া উঠিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, তিন বারই রোগী মোড়কের কাগজ সমেত ঔষধ বাটিয়া সেবন করিয়াছিল।

প্রত্যুষে চা পান করিয়া আমরা ডাকবাংলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বরফ দেখিতে বসিলাম। তখন নবোদিত সূর্যের কিরণে তুষার-গিরির কিরীটগুলি সবে মাত্র সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নাংশ তখনও স্নিগ্ধ নীলাভ। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র তুষার অত্যুজ্জ্বল রৌপ্যের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্তকালের তুলনায় বরফের উদয়সূর্যের লীলা অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী এবং কম বৈচিত্র্যময়। নীলাভ বর্ণ হইতে উজ্জ্বল বর্ণে পরিণত হইতে প্রাতঃকালে যতটা সময় লাগে, সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বল বর্ণ হইতে নীলাভ বর্ণে পরিণত হইতে বোধকরি লাগে তাহার চতুর্গুণ।

বরফের উপর প্রভাত সূর্যের এই বিচিত্র লীলা অধিকক্ষণ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে ছিল না। এজেন্সির চাপরাশি আসিয়া সংবাদ দিল, কয়েক দিন পূর্বে ডেপুটি কমিশনার সাহেব বহু সংখ্যক কুলি লইয়া সফরে গিয়াছেন বলিয়া পাটোয়ারি আমাদের জন্য কুলি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। আবার এমন সংবাদও পাওয়া গেল যে, সম্ভবতঃ সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে ডেপুটি কমিশনার সদলবলে লমগড় ডাকবাংলায় পৌঁছিবেন।

লমগড় হইতে আমাদের নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায় যদি না হইয়া উঠে, এবং ডেপুটি কমিশনার যদি সত্যসত্যই সন্ধ্যার সময়ে লমগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমাদের যে সঙ্কটের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা বিচলিত হইয়া উঠিলাম,—তুষার ও সূর্য-কিরণের সমস্ত কাব্য এক মুহূর্তেই অন্তর্হিত হইল। পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের নিয়মানুযায়ী ডাকবাংলায় সরকারি কর্মচারীর অধিকার সর্বাগ্রে। সন্ধ্যার সময় ডেপুটি কমিশনার আসিয়া যদি ডাকবাংলো ছাড়িয়া দিবার জন্য নিয়ম-মত তিন ঘণ্টার নোটিশ দিয়া বসেন, তখন

হয় বচসা, নয় তরুতল, এই দুয়ের মধ্যে যা-হয় একটিকে অবলম্বন করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখা গেল, ইহাদের মধ্যে একটিও তৃপ্তিপ্রদ হইবে না।

উভয় পক্ষের ভদ্রতায় যদি মাঝামাঝি একটা রফা হয়, তাহাতেও আমাদের সুবিধা হইবে না, কারণ একটি ঘরে আমাদের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব কোনো প্রকারে সন্ধ্যা অবধি পরবর্তী স্টেজ মোরনালায় পৌঁছাইতে পারিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হয়। অন্ততঃ তিন চারখানা ডাণ্ডি ও একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার মতো কুলি যাহাতে সংগ্রহ হইতে পারে, সেজন্য এজেন্সির চাপরাশিকে পাটোয়ারির নিকট পুনরায় পাঠানো হইল। বিশেষভাবে অর্থের লোভ এবং অনর্থের ভয় দেখাইয়া চাপরাশিকে তৎপর করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দণ্ড ও পুরস্কারের মাত্রা যতই বাড়াইয়া দেওয়া যাক্ না কেন, লোকের অভাবে লোক সংগ্রহ করা অসাধ্য ব্যাপার।

বেলা একটা পর্যন্ত যে-কয়েকটি কুলি সংগ্রহ হইল তাহাতে দেখা গেল, নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, অর্থাৎ রাত্রের জন্য আহারের উপকরণ ও শয়নের ব্যবস্থা, কোনো প্রকারে সঙ্গে যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে, 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' আমরা অর্ধেকের অনেক অধিক ত্যাগ করিয়া মোরনালা যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম।

লমগড় হইতে মোরনালা সাড়ে আট মাইল পথ। এ পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে সকলেই, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও, প্রস্তুত হইলেন। শুধু যে বাধ্য হইয়া, তাহা নহে; এ বিষয়ে অনেকের বিশেষ উৎসাহ এবং আনন্দ দেখা গেল। আমাদের অভিযানের ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন কয়েক দিন হইতে দুঃখ করিতেছিলেন যে, ডাণ্ডির উপর সমাসীন হইয়া পথ চলিতে চলিতে, দুই বেলা যথারীতি ভোজন কার্য সারিতে সারিতে, এবং প্রতি রাত্রে ডাকবাংলোর আরামপ্রদ কামরার

সুখশয্যায় দীর্ঘ এবং গভীর নিদ্রা উপভোগ করিতে করিতে হিমালয় ভ্রমণ মঞ্জুরই নহে। দুই চার দিন যদি তরুতল বাস এবং দুই তিন বেলা যদি উপবাস না করিতে হইল, এবং সকলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত এবং অভগ্ন রহিল, তাহা হইলে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কি এমন পরমার্থ লাভ হইল? আজ এক চটি হাঁটিয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিশেষ উৎসাহের সহিত মশাল প্রস্তুত করাইতে বসিয়া গেলেন। মোরনালা পৌঁছিবার পূর্বে পথে রাত্রি সমাগম হইয়া অন্ধকার হইলে এগুলি কাজে লাগিবে।

আমাদের রওয়ানা হইবার কিছু পূর্বে পাটোয়ারি জানাইল, যে কয়েকজন কুলি লমগড় হইতে মোরনালা পর্যন্ত শুধু এক স্টেজের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, 'বুতাত' (খোরাকি) বাবত তাহাদিগকে আড়াই টাকা দিতে হইবে। ললিতবাবু তখন যাত্রা-আয়োজনের গুরুতর কার্যে ব্যাপৃত। চিত্তরঞ্জন তাঁহার নিজের মনিব্যাগ হইতে দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া পাটোয়ারির হাতে দিলেন।

নোট ভাঙ্গাইয়া কুলিদের পাওনা মিটাইয়া দিয়া পাটোয়ারি বাকি সাড়ে সাত টাকা চিত্তরঞ্জনকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

টাকা লইবার কোনো উপক্রম না করিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "উয়হ তুমকো বকশিশ্ দিয়া।"

এ কথার যাহা সরল আভিধানিক অর্থ, তাহা ত' এমন-কিছুই অস্পষ্ট নহে। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত আপাতসরল অর্থেও ত' এ কথাকে গ্রহণ করা যায় না। নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় অর্থ আছে বিবেচনা করিয়া পাটোয়ারি বলিল, "হুজুর, সমঝা নহি।" অর্থাৎ, হুজুর বুঝতে পারলাম না।

চিত্তরঞ্জন নিজে একটু কম শুনিতেন, মনে করিলেন পাটোয়ারি

কানে একটু কম শুনে। তাই ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "উষহ্ তুমকো বকশিশ্ দিয়া।"

অবিকল একই ভাষা।

পাটোয়ারি কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল। এমন সঙ্কটে সে জীবনে খুব বেশীবার পড়ে নাই। বকশিশের একমাত্র অর্থ পুরস্কার বলিয়াই ত' সে জানে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক কুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারা ছাড়া, পুরস্কার পাইবার মতো আর কোন্ কাজই বা সে করিয়াছে, তাহাও ত' ভাবিয়া পায় না। অবশ্য, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কোনো প্রকারে উপস্থিত চালাইবার মতো ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য একান্তই যদি পুরস্কার দিতে হয় ত' আট আনাই যথেষ্ট। সাড়ে সাত টাকা পুরস্কারের কোনও মানে হয়? কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইতেই হইবে, অথচ সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তিকে বারংবার এক কথা বলিতে সঙ্কোচও বোধ হয়। করজোড়ে কাতর কণ্ঠে পাটোয়ারি বলিল, "মাফ কিয়া যায় হুজুর, সম্ঝা নহি।" ক্ষমা করুন হুজুর, বুঝতে পারিনি।

এবার চিত্তরঞ্জন ধৈর্য হারাইলেন। সত্যই ত',—এক কথা বারবার তিন বার বলিতে হইলে কোন্ ভদ্রলোক ধৈর্য ধারণ করিতে পারে। পাটোয়ারির সম্মুখে অঙ্গুলি নাড়িয়া চিত্তরঞ্জন গর্জন করিয়া উঠিলেন, "উয়হ্ তুম রখ্ লেও। তুমকো বকশিশ দিয়া।"

বাপ রে। দানের দাপট দেখিয়া আমরা ত' একেবারে তটস্থ।

এ পর্যন্ত যাহা অবিশ্বাস্য ছিল তাহাতে প্রতীতি লাভ করিয়া ও-দিকে পাটোয়ারি ত' একেবারে আনন্দে আত্মহারা। দুই বাহু আভূমি নত করিয়া করিয়া বারংবার সে চিত্তরঞ্জনকে অভিবাদন জানাইতে লাগিল। তাহার চক্ষে জগতের রঙ খানিকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সাড়ে সাত টাকা তাহার নিকটে সামান্য অর্থ নহে,—প্রায় তাহার এক মাসের বেতন। মহানবমীর মেলায় এই টাকা দিয়া সে স্ত্রীর জন্য শাড়ি, কন্যার

জন্য চুড়ি, পুত্রের জন্য রেলগাড়ি খরিদ করিয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিবে। তাহার অর্থকষ্টের গাঢ় অন্ধকারে একটা দিকে হঠাৎ এক ঝলক আলোক আসিয়া পড়িয়াছে।

অনেকেরই অন্ধকারের উপর চিত্তরঞ্জন এইরূপ আলোকপাত করিতেন, সে কথা ভারতবর্ষের বহু লোকের জানা আছে।

বেলা তিনটার সময়ে আমরা মোবনালার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

২৬

লমগড় হইতে মোরনালার পথে আমাদের সঙ্গে মাত্র একখানি ডাণ্ডি রহিল, কাহারও তেমন প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করা চলিবে। কিন্তু প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পরও কাহারও ডাণ্ডি ব্যবহার করিবার মতো কোনো লক্ষণ অথবা আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। এমন কি যাঁহাদের জন্য আমরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত বোধ করিতেছিলাম, সেই মহিলাগণই অর্ধমাইল পথ আমাদের আগে আগেই চলিয়াছিলেন। সম্মুখে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, ইচ্ছা থাকিলেও পুরুষদের মধ্যে কাহারও ডাণ্ডিতে উঠিবার মতো নির্লজ্জতা ছিল না। তাহা ছাড়া, শ্রান্তি ও বিরক্তির প্রতিষেধক স্বরূপ মনোরম দৃশ্য এবং স্নিগ্ধ সমীরণ ত ছিলই।

কিন্তু অর্ধপথে পৌঁছিয়া যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা শুনিয়া আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম।

মোরনালা ডাকবাংলা আমাদের জন্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের রওয়ানা হইবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্বে মোরনালায় লোক পাঠান হইয়াছিল। সে আসিয়া জানাইল, ডাকবাংলা পাওয়া যাইবেনা, এক গোরা সাহেব আসিয়া বাংলা দখল করিয়াছে, এবং সন্ধ্যার পূর্বে তাহার আরও দুই তিন জন সহচর আসিবার কথা আছে। সে রাত্রে তাহারা সেখানেই থাকিবে। বাংলা রক্ষকের পরামর্শ, সেদিন আমাদের মোরনালা না গিয়া একদিন পরে যাওয়াই উচিত।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়া গেল। যাহা অধিকার করিতে যাইতেছিলাম তাহা অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার অধিকার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ এতক্ষণে অধিকৃত হইয়া গেল। অগ্রসর হইলেও সুবিধা নাই, প্রত্যাবর্তনেরও উপায় নাই। নূতন বন্দোবস্তের পূর্বে পুরাতনে যাহারা ইস্তফা দিয়া বসে, তাহাদের অবস্থা এইরূপই হয়।

দুইটি প্রাচীন বাক্য বহুদিন হইতে জানা আছে, রচনার মধ্যে, শিক্ষাদান কালে, এবং আরও নানা প্রকার অবস্থায় বহুবার তাহাদের ব্যবহার করা গিয়াছে, কিন্তু একদিন যে সে-দুটি পাশাপাশি দৃঢ়নিবন্ধ হইয়া আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন নিদারুণ ভাবে প্রয়োগ লাভ করিবে তাহা জানিতাম না। এই কঠিন জীবনসংগ্রামের যুগে অবিবেচনার ফলে বহুবার 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইতে হইয়াছে, এবং সংসার-অরণ্যে মাঝে মাঝে পথ হারাইয়া এমন অজ্ঞাত এবং অনিরূপেয় স্থলে পৌঁছানো গিয়াছে, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার মধ্যে পড়িয়া গতি হারাইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত একদিনও এমন গুরুতর ভাবে 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া এমন দীর্ঘকাল ধরিয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা ভোগ করিতে হয় নাই।

ললিতবাবু বলিলেন, "ভালই হয়েছে, তবু একটা দিন একটু অ্যাড-ভেঞ্চার (ডাংপিটামি) করা যাবে। আগুন জ্বেলে ওভারকোট জড়িয়ে গাছতলায় পুরুষেরা রাত কাটাবে, আর মেয়েদের জন্যে গাছের ডাল ভেঙ্গে গায়ের কাপড় জড়িয়ে তাঁবু তৈরী ক'রে দেওয়া যাবে।"

ললিতবাবু বালক নন, বালকের প্রৌঢ় পিতা, তবু তাঁহার কথা 'অমৃতম্ বালভাষিতম্' মনে করিয়া তাহার যুক্তি গ্রহণ না করিতে পারিলেও মাধুর্য গ্রহণ করা গেল। সেই প্রখর শীতের রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের দৃষ্টি এবং লিপ্সার বিষয়ীভূত হইয়া সমস্ত রাত্রি গাছতলায় বসিয়া অ্যাড্‌ভেঞ্চার করিবার মতো ঔৎসুক্য কাহারও প্রকাশ পাইল না।

যেখানে আমরা এই দুঃসংবাদ পাইলাম, দৈবযোগে ঠিক সেইখানেই এক সাহেবের দুইটি বাড়ি ছিল। কুলিরা বলিল, তন্মধ্যে একটি বাড়ি খালি আছে, রাত্রের মতো সেখানি অধিকার করিতে না পারিলে যথার্থই বিপদের কথা। গত্যন্তর না দেখিয়া তখন সেই চেষ্টাই করিতে হইল। শ্রীমান চিররঞ্জন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; এবং আমরা

সাহেব স্বীকৃত হইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিলে কি বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিব, মনে মনে তাহার ভাষা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের রক্ত মাংস এবং হাড়ের উপর ভারতবর্ষের জল হাওয়া এবং মাটি কাজ করিয়াছে, দেহের সহিত তাহাদের মনও এমন এক বিচিত্র ভঙ্গীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে, যাহার সহিত জগতের অপরাপর অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব তেমন খাপ খায় না। আমরা যেমন-শীঘ্র বিশ্বাস করি, তেমনি-সহজে আশ্বাস পাই। অধিকার করার চেয়ে আশ্রয় পাওয়া সহজ এবং অল্প হাঙ্গামাজনক, আশ্রয় পাইয়া পাইয়া সে ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। অপর পক্ষে, অধিকার করিয়া করিয়া তাহাদের মন এমনই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আশ্রয় দেওয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া, এবং আশ্রয় চাওয়াকে অপমানিত হওয়া মনে করে। তাই তাহাদের দেশে শীতের রাত্রে দরিদ্র পথিককে গৃহস্থের দরজার সম্মুখেও বরফ চাপা পড়িয়া মরিতে শুনা যায়।

প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর দেখা গেল শ্রীমান চিররঞ্জন আসিতেছেন, এবং তাঁহার সহিত শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ সাহেব। মন্থর গতি দেখিয়া বুঝা গেল গতিক মন্দ। তথাপি, সাহেবের পায়ে বাতের বেদনাও থাকিতে পারে মনে করিয়া, আশায় নির্ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকা গেল।

সাহেব আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, এবং এত জিনিসপত্র ও মহিলাদের লইয়া পূর্বে মোরনালা ডাকবাংলা স্থির না করিয়া অর্ধ পথ চলিয়া আসার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য স্নেহসূচক মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন।

আমরা কহিলাম, সাহেব যে-কথা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই সাহেবের নিকট আমাদিগকে উপস্থিত

হইতে হইয়াছে। পূর্বাহ্নে ডাকবাংলা অধিকৃত করিয়া রাখিলে এ সকল কথার কোনো প্রয়োজন অথবা সার্থকতা থাকিতনা। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সাহেবের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা এ দুইটা পরস্পববিরোধী ব্যাপার নহে, বরং বিশেষভাবে দৃঢ়সম্বদ্ধ। সে হিসাবে, সাহেব যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলেও অবান্তর।

উত্তরে সাহেব বলিলেন, সে রাত্রে আমাদিগকে অতিথিরূপে লাভ করিতে পারিলে তিনি যৎপরোনাস্তি সুখীই হইতেন, কিন্তু আমাদেরই হিতার্থে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তিনি সমীচীন মনে করিতেছেন। কারণ, যদিই বা আমাদিগকে স্থান দেওয়া কোনোরূপে সম্ভব হইত, অজানা অপবিচ্ছন্ন কুলিদিগকে তিনি কিছুতেই তাঁহাব গৃহে স্থান দিতেন না। সেরূপ অবস্থায়, পথেব মাঝখানে পবদিন কুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইত। তখন আমবা এক বিপদ সামলাইতে গিয়া অপব এক বিপদেব মধ্যে পডিতাম। তদপেক্ষা সোজা মোরনালা চলিয়া যাওয়াই ভাল। সেখানে ইয়োবোপীয়ানবা আছেন, মহিলাদিগকে তাঁহাবা একটা ঘর নিশ্চয়ই ছাডিয়া দিবেন। অতএব, রাত্রি হইয়া আসিতেছে, আব বেশি সময় নষ্ট না কবিয়া পথ দেখাই কর্তব্য।

সংসারে হিতৈষণা জিনিষটা দুর্লভ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না। সেই জন্য অকারণে অতিমাত্রায় কাহাকেও স্নেহশীল এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিতে দেখিলে মনের মধ্যে খটকা বাধে। এত বিস্তারিত ভাবে সাহেব আমাদের হিতাহিত বিবেচনা করিতেছেন দেখিয়া গভীর সন্দেহের উদয় হইল। প্রকাশ্যে বলা গেল, একবার অবিবেচনার কাজ করিয়াছি বলিয়াই সাহেব যেন মনে না করেন যে, হিতাহিত জ্ঞান আমাদের একেবারেই নাই। আজ রাত্রে গাছতলায় বাসের সম্ভাবনা, এবং কাল প্রাতে যথেষ্ট কুলি না পাওয়ার আশঙ্কা,—এই দুইটার মধ্যে কোনটা অধিকতর আপত্তিজনক, সেটা যে

আমরা একেবারে বুঝি না, তাহা নহে। আমাদের দ্রব্যাদি সোজা মোরনালায় চলিয়া যাইতে পারে, এবং পরদিন প্রাতে আমরা পদব্রজে মোরনালা যাত্রা করিতে পারি। সে অবস্থায় কুলির প্রয়োজনই হইবে না। আমাদের শয্যা এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষ বহন করিবার মতো আমাদের সহিত যথেষ্ট ভৃত্য আছে। তাহা ছাড়া, সাহেব যেন মনে না করেন কাল প্রাতে আমরা শুধু ধন্যবাদ দিয়াই প্রস্থান করিব। এক রাত্রির জন্য যে ভাড়াই সাহেব চাহিবেন, তাহাও আমরা ধন্যবাদের সহিত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

কথামালায় ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের গল্পে জানা গিয়াছিল যে, দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। বর্তমান ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে, হিতৈষী ব্যক্তিরও দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। সাহেব বলিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর আগমনের সম্ভাবনা আছে, আমাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার পর তাহারা আসিয়া পড়িলে আমাদের পক্ষেও অসুবিধার কারণ হইতে পারে। অতএব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হিতৈষী ব্যক্তির নিকট হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করাই যে একমাত্র কাম্য, সে বিষয়ে আমাদের আর অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ভদ্র ভাষা ও ভদ্র ভঙ্গীর সাহায্যে মানুষ যে এতটা অভদ্র হইতে পারে, বোধ করি তাহা এই প্রথম দেখিলাম। মনে মনে সাহেবের মঙ্গল কামনা করিয়া মোরনালা অভিমুখে অগ্রসর হওয়া গেল।

মোরনালায় ডাকবাংলার সাহেবের সহিত আলাপটা কিরূপ জমিতে পারে তাহার আন্দাজ লইবার জন্য শ্রীমান চিররঞ্জন অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রগামী হইলেন। সেখানে ব্যবহারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে, তদ্বিষয়ে এইমাত্র ভরসা ছিল যে, শুনা গিয়াছিল ঐ ব্যক্তি সৈনিক কর্মচারী। গোরার আচরণ আর যেরূপই হউক না কেন, সাধারণত সরল এবং সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে কোনো প্রকার অনিশ্চয়তার কুহেলিকা তাহার মধ্যে থাকে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা সমাগত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেদিন শুক্লা সপ্তমী হইলেও সেই নিশ্ছিদ্র অরণ্য ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ আসিবার পথ ছিল না, কাজে কাজেই কয়েকটি মশাল জ্বালিতে হইল। মশালের উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিকের অন্ধকার আরও দুর্ভেদ্য এবং ঘন হইয়া উঠিল, এবং আলোকদীপ্ত বৃক্ষলতার উপর অতগুলি প্রাণীর দীর্ঘ এবং গতিশীল ছায়া বিকীর্ণ হইয়া এক বিচিত্র এবং ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। দল বাঁধিয়া, মশাল জ্বালিয়া, পদদলিত বৃক্ষপত্রের এক বিচিত্র খস্‌খস্‌ শব্দ করিতে করিতে যাওয়ার মধ্যে বেশ একটু ভীতিজড়িত অভিনবত্বের আনন্দ পাওয়া যাইতেছিল। মশালের প্রদীপ্ত আলোক ও অরণ্যের প্রগাঢ় অন্ধকার—এই দুই বিরুদ্ধ বর্ণের লেপনে সমগ্র পরিবেশ এমন এক অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়াছিল যে, মনে হইতেছিলনা আমাদের অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য মোরনালা ডাকবাংলার একখানি ঘর অধিকার করা।

কি কারণে বলা কঠিন, আমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি সহসা অতিরিক্ত মাত্রায় তীক্ষ্ণতা লাভ করিল। তাঁহারা পদে পদে নানাপ্রকার সন্দেহজনক আকৃতি এবং শব্দ দেখিতে ও শুনিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতবাবুর ঘ্রাণশক্তি এমনই প্রখর হইয়া উঠিল যে, বাঘের বোটকা গন্ধ তাঁহার নাসিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপন করিবার উপক্রম করিল। শ্রীমান সতীন্দ্রনাথ তাঁহার আসামে বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতার অধিকারে এমন সব লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন যে, আমাদের মনে হইতে লাগিল, ভীষণ গর্জন করিয়া একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের মধ্যে লাফাইয়া না পড়ে। নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘকে ভয় করেনা, এমন দুঃসাহসী আমাদের মধ্যে কেহও ছিলেন না, তথাপি, কি কারণে বলিতে পারি না, ললিতবাবু ও সতীন্দ্রনাথ যতই বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তৎপর হইতে লাগিলেন, ততই

আমাদের মনে ভয়ের অংশ কমিয়া কৌতুকের অংশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুইমাইল পথ অতিক্রম করিবার পর বন ছাড়িয়া আমরা উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। এখান হইতে ডাকবাংলা পুরা একমাইল পথও বোধহয় নহে, কিন্তু পথের এই অংশটুকু এমন উৎকট চড়াই যে, লমগড় হইতে এ পর্যন্ত আসিতে আমরা যত না পরিশ্রান্ত হইযাছিলাম, ততোধিক পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইয়াছিল এই পথটুকু অতিক্রম করিতে।

২৭

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময়ে আমরা মোবনালার ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। শোনা গেল, ডাকবাংলায় সাহেব মাত্র একজন। অপর যাহাদের আসিবার কথা ছিল, তাহারা কেহও আসে নাই। কিন্তু একজন শুনিয়া উৎকণ্ঠা আমাদের বিশেষ কিছু কমিল না। পূর্বে যে সাহেবকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, এ সাহেবও যদি তাহারই মত 'একাই একশ' হয়, তাহা হইলে যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহারা আসিলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মন সমস্ত শঙ্কা এবং সঙ্কোচ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শরৎকালের নির্মেঘ আকাশের মত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমরা পৌঁছিবা মাত্র সাহেব চিররঞ্জনের সহিত বাহুনিবদ্ধ হইয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি চিররঞ্জনের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং শীতের রাত্রে মহিলাগণ দীর্ঘপথ পদব্রজে আসিতেছেন শুনিয়া নিজ কক্ষে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাইয়া, ও হাত-মুখ ধুইবার জন্য জল গরম করাইয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও বিষয়ে আমাদের কোনও প্রকার অসুবিধা হইবে না তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, দুইটি ঘরের মধ্যে একটি ঘরে মহিলারা থাকিবেন, অপর ঘরটিতে পুরুষেরা সকলে। এমন কি, আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি, তিনি তাঁহার নিজের ঘরও একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বারান্দায় থাকিতে পারেন।

সংসারে মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্যের সীমা নাই। যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও একজন বলে, বন্ধু আসিবে, স্থান হইবে না, আর, আর-একজন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া নিজের অধিকৃত স্থান অপরকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত! এই গোরা সাহেবটির নাম লেফ্‌টেন্যাণ্ট জনস্টন্ পীক।

ইনি আমাদের সহিত যে-ব্যবহার করিলেন, একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তাহা যে বিশেষ-কিছু অদ্ভুত অথবা অসাধারণ ব্যাপার, সে কথা বলি না। কিন্তু যে-যুগে ভদ্রতা অপৌরুষের সগোত্র, এবং পরার্থপরতা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক,—যে-যুগে নাকে ঘুসি এবং প্লীহায় লাথি না মারিলেই মানুষ ভদ্র, সে যুগে লেফটেন্যাণ্ট পীকের ভদ্রতা একটু অসাধারণ বলিয়াই ঠেকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে উদিত হয়। ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে আমাদের সামান্য যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে মনে হয়, ইংরাজ সিভিল কর্মচারী অপেক্ষা মিলিটারি অফিসারগণ সাধারণতঃ একটু বেশী ভদ্র এবং উদার। ইহার কারণ কি, তাহা সঠিক নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু কথাটা যে সত্য, তাহা আমি কেবল মাত্র লেফ্‌টেন্যাণ্ট পীকের কথা মনে করিয়াই বলিতেছি না। লেফটেন্যাণ্ট্ পীক্ এ সত্যের প্রমাণ নহেন, দৃষ্টান্ত মাত্র। একজন ইংরেজ রাজপুরুষ যে-পরিমাণে মনে করে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইবে অন্তঃশত্রুর, অর্থাৎ ভারতীয়ের, হাত হইতে, ঠিক সেই পরিমাণে একজন ইংরাজ মিলিটারি অফিসার মনে করে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইবে ভারতবর্ষের বহিঃশত্রুর হাত হইতে। আমার মনে হয় চিন্তাভঙ্গীর এই পার্থক্যের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে আচরণ ভেদের হেতু।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ পীক আমাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গই প্রধান। ইনিও যুদ্ধে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। দুই তিনদিন পরে ইঁহাকে আলমোরা হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে হইবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইঁহার অভিমত,—উপস্থিত জার্মানি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে হারিতে হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। খবরের কাগজের সংবাদের উপর ইঁহার আস্থা অতি অল্প।

নানাপ্রকার গল্পে ও আলোচনায় প্রায় দশটা বাজিয়া গেল।

ইত্যবসরে আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে। আহারাদি সমাপন করিয়া দুইটি শয়নকক্ষে বিভক্ত হইয়া আমরা নিজ নিজ আশ্রয়ে কায়েম হইলাম। একটি কক্ষে শয়ন করিলেন লেফ্টেন্যাণ্ট পীক এবং চিত্তরঞ্জন, অপর কক্ষে আমরা সাতজনে। আমাদের কক্ষের অবস্থা কতকটা মুসাফির-খানার মতো। ঘর জুড়িয়া সাত ভাবে সাতখানা শয্যা পড়িয়াছে, ফালতু জায়গা নিতান্ত অল্প।

বোধকরি অতি-ক্লান্তি বশতঃ সহজে কাহারো ঘুম আসিতেছিল না। চিত্তরঞ্জন তাস খেলার প্রস্তাব করিলেন। আমাদের সঙ্গে আটদশ জোড়া তাস চলিয়াছিল। তাহার মধ্যে একজোড়া আনাইয়া খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। বত্রিশখানা তাসের গ্রাবু খেলা। গ্রাবু ভিন্ন অন্য কোনো খেলা চিত্তরঞ্জন খেলিতেন না। গ্রাবু খেলায় তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। বত্রিশখানা তাসের হিসাব যেন তাঁহার নখদর্পণে থাকিত।

তাসখেলার কল্যাণে ক্ষণকাল পরে আমাদের চক্ষে নিদ্রা ঘনাইয়া আসিল।

কুলি ও ভৃত্যগণের জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধির শব্দে ও কোলাহলে অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অভিজ্ঞতায় মানুষের বিবেচনা শক্তি বাড়ে। পূর্বদিবসে লমৃগড়ের ডাকবাংলায় কুলির প্রত্যাশায় বেলা একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যে বিপদে পড়া গিয়াছিল, পুনরায় সেরূপ অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করিবার জন্য আমরা ষোল আনা নারাজ ছিলাম। তাহা ব্যতীত, লমগড় হইতে মোরনালা পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া সকলেরই মনে এমন একটু সাহস এবং আত্মনির্ভরতা স্থানলাভ করিয়া-ছিল যে, পুনরায় কুলির জন্য এজেন্সির চাপরাশি এবং পাটোয়ারীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা কাহারো নিকট উচিত অথবা আবশ্যক বলিয়া মনে হইল না।

শিমলা দার্জিলিঙ প্রভৃতি শৈলাবাসে যাঁহারা সাত-আট মাইল পথ

নিয়ত এবং নিয়মিত বেড়াইয়া থাকেন, লমগড় হইতে মোরনালা আট-দশ মাইল পথ হাঁটিয়া সাহস এবং আত্মনির্ভরতা অর্জন করিবার কথা শুনিয়া তাঁহারা হয়ত মনে মনে হাসিবেন। আমিও হাসিতাম, যদি না আমার মোরনালা-লমগড় পথের পথিক হইবার সুযোগ ঘটিত। শিমলায় অবস্থান কালে আমিও ইচ্ছা হইবামাত্র, অনেক সময়ে একাকীই, জ্যাকো পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতাম। জ্যাকো রাউণ্ডের পথও সাত-আট মাইলের কম নহে। কিন্তু শিমলা দার্জিলিঙের প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ আট-দশ মাইল পথ এবং লমগড মোরনালার আট দশ মাইল পথের মধ্যে প্রভেদের হিমালয় বিদ্যমান। এ পথ যে কেবল বন্ধুর এবং সঙ্কীর্ণ তাহাই নহে, স্থানে স্থানে বাস্তবিকই দুর্গম এবং বিপজ্জনক। কোনো কোনো জায়গায় পথ এতই সঙ্কীর্ণ যে, পাশাপাশি দুইটি ঘোড়া যাওয়াও নিরাপদ নহে। পার্শ্বে গভীর-অতল খড্ (খাদ), নিচের দিকে তাকাইয়া দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায় ; এবং পদস্খলিত হইয়া সেই অতলের তলদেশে পৌঁছিবার পক্ষে একটা ইঁট অথবা পাথরের টুকরারও বাধা-নিষেধ নাই। তাহার উপর, কুলিগণ যখন গল্পচ্ছলে কোনো স্থান নির্দেশ করিয়া বলে যে, কিছুদিন পূর্বে তথায় পদস্খলিত হইয়া আরোহীসহ ঘোড়া নিচে নামিয়া গিয়া রক্তমাংসের এমন দুর্নির্ণেয় তাল পাকাইয়াছিল যে, কোন্ অংশটা আরোহীর এবং কোনটা ঘোড়ার তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না,—তখন মনের মধ্যে ঠিক শিমলা-দার্জিলিঙ পথের পুলকের উদ্রেক হয় না।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, মোরনালা হইতে দেবীধূরার পথের এক অংশ অব্যবহার্য হইয়া যাওয়ায় চার মাইল দীর্ঘ একটি নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছে। কেবলমাত্র সদ্যনির্মিত বলিয়াই এ পথটি বিপজ্জনক নহে। পথটি আরও অনেক সঙ্কীর্ণ। পুরাতন পথের খানিকটা অংশ ধ্বসিয়া পড়ায় কাজ চালাইবার মতো করিয়া তাড়াতাড়ি পথটি নির্মিত হইয়াছে। মোরনালা হইতে দেবীধূরার দূরত্ব সাড়ে দশ মাইল,—কিন্তু এই নূতন

পথ দিয়া আরও একটু ঘুরিয়া যাইতে হয় বলিয়া মোটের উপর পথ দাঁড়াইয়াছে বারো মাইল।

এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মহিলাগণ ডাণ্ডিকুলির জন্য অপেক্ষা করিতে চাহিলেন না, পদব্রজে যাওয়াই মনস্থ করিলেন। পূর্বদিন সমস্ত পথ হাঁটিয়া আসিয়া সকালে উঠিয়াই পুনরায় বারো মাইল পথ হাঁটিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বাস্তবিকই প্রশংসা উৎপাদন করিবার যোগ্য। বহু দিন হইতে আমাদের দেশে নারী বিবর্জিত হইয়া পথ চলিবার সপক্ষে একটি প্রবচন চলিত আছে। কতদিন পূর্বে এবং দেশের কি অবস্থায় এ প্রবচনটির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু বহু পুরাতন বিষয়ের সহিত এ প্রবচনটিও বর্তমান যুগে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অন্ততঃ মায়াবতীর পথে ইহার সার্থকতার কোনো পরিচয় আমরা পাই নাই। এই দুরূহ, দীর্ঘ এবং দুর্গম পথে যথাসময়ে আহার, বিশ্রাম এবং নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া যাঁহারা পুরুষদের সবল ও সুস্থ রাখিয়াছিলেন, এবং নিজেদের অস্তিত্বের দ্বারা যাঁহারা অপর পক্ষকে ক্ষণমাত্র বিব্রত করেন নাই, পথে তাঁহাদিগকে বিবর্জিত না করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বচনটিকে বর্জন করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মোরনালা পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বাংলা হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোনো পরিচয় আমরা পাই নাই। প্রত্যূষে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল! সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত উচ্চ তুষারমালা রবিকরোজ্জ্বল প্রসন্ন নীল আকাশে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছে, তাহার নিম্নে স্তরে স্তরে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত পর্বতের শ্রেণী, নিকটস্থ পর্বতগুলিতে ঘন নীল বর্ণের কেলু, চিড় ও অন্যান্য পার্বত্য বৃক্ষসকল যেন কেহ সযত্নে সাজাইয়া গিয়াছে; সমস্ত গাছ-পালা পাহাড়-পর্বত সুবিস্তৃত আকাশের স্নেহ-দৃষ্টিতলে যেন এক বিচিত্র সজীবতা ও নির্মলতায় স্নাত হইয়া হাসিতেছে।

এই অপূর্ব-গভীর সৌন্দর্য-ধারায় নিমগ্ন হইয়া আমরা নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এমন সময়ে উপকারী বন্ধুর বিদায়-সম্ভাষণে সহসা আমাদের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, অদূরে দাঁড়াইয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট পীক আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য স্মিতমুখে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মালপত্র ভৃত্য প্রভৃতি ইতিপূর্বেই নামিয়া গিয়াছে, আমাদের নিকট বিদায় লইয়া ইনি রওয়ানা হইবেন।

মাত্র এক রাত্রির পরিচয়, কিন্তু মনে হইতেছিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট পীক যেন আমাদের কত দিনের পরিচিত বন্ধু, যেন কত আপনার। পরিচয়ের বিস্তৃতির উপর অন্তরঙ্গতা তত নির্ভর করেনা, যত করে গভীরতার উপর। তাই লেফ্‌টেন্যাণ্ট পীককে বিদায় দিবার কালে আমাদের মনে বেদনার একটি সূক্ষ্ম তন্ত্রী বাজিতে লাগিল। পীক একে একে আমাদের সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণে রওয়ানা হইলেন। আমরাও গন্তব্যের অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

আমাদের পথের মধ্যে আমরা যতগুলি ডাকবাংলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে করিব, তন্মধ্যে মোরনালার ডাকবাংলার উচ্চতাই সর্বাপেক্ষা অধিক। সমুদ্রস্তর হইতে মোরনালা ৭৩৭৫ ফুট উচ্চ।

বেলা নয়টার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কুলি ও লান্দ্‌ঘোড়ার পিঠে পাঠাইয়া দিয়া আমরা পরবর্তী চটি দেবীধূরার অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

আমাদের বিচিত্র এবং বৃহৎ দলটি ধীরে ধীরে দেবীধূরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সারা রাত্রির সুনিদ্রা ও বিশ্রামের ফলে শরীর হইতে সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদ অপসৃত হইয়া আমাদের মন সেদিনকার প্রভাত বায়ুর মতই লঘু এবং গতিশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সুদূর পথের এঞ্জিনের মতো যাত্রা করিবার কালে আমাদেব মধ্যে উৎসাহ-উদ্যমের জল-কয়লা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

পায়ের তলায় শিশিরভেজা ধূলিবিহীন পথ। সুদীর্ঘ সবল চিড ও দেওদার বৃক্ষের ঘনসন্নিবেশেব অবকাশের সাহায্যে আলো ও ছায়ার অপরূপ নক্সার দ্বারা খচিত সেই পথ, পথের উভয় পার্শ্বে মাঝে মাঝে পাহাড়ি কামিনীর গাছ, গাছের তলায় অসংখ্য ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের সুমিষ্ট-গুরু গন্ধে অন্তরেব নিভৃত প্রদেশ পর্যন্ত যেন ভিজিয়া উঠিতেছে, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত উজ্জ্বল তুষারমালা। পথের এক পার্শ্বে বিরাট পর্বত গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এবং অপর পার্শ্বে গভীব খড নিচে নামিয়া গিয়াছে।

পর্বতের তলদেশে পাহাড়িদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের বাহিরে চতুর্দিকে শস্যক্ষেত্র, ক্ষেত্রে নানা বর্ণের নানা প্রকারের শস্য ফলিয়া রহিয়াছে। উপর হইতে দেখিলে মনে হয় কেহও যেন মূল্যবান বিচিত্র গালিচা বিছাইয়া বাখিয়াছে। পথের ধারে ধারে পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া অনেকগুলি নির্ঝরিণী নামিয়া আসিয়াছে—কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বৃহৎ, কোনোটি শান্ত, কোনোটি প্রখর, কোনোটি মৃদুগতি, কোনোটি বা বেগবতী। সুশীতল সমীরণ, সুখস্পর্শ সূর্যকর, ফুলের গন্ধ, ঝরণার গান এবং তুষারের লীলার দ্বারা নন্দিত হইতে হইতে আমরা আগাইয়া চলিলাম।

এক সময়ে পথের মধ্যস্থলে একটি বিচিত্র এবং অতি বৃহৎ কীট দেখা

গেল। বড় আকারের গলদা চিংড়ি ভিন্ন এত-বড় কীট আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কীটটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ইঞ্চি, দেহ ঘন কৃষ্ণবর্ণের, এবং গতি যৎপরোনাস্তি মন্থর। কীট বেচারীর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে জীবতত্ত্ববিদ্ কেহও ছিল না বলিয়া কেবল মাত্র আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াই সে পরিত্রাণ পাইল।

দেবীধুরায় পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় রাখিয়া বাহির হওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সেই কারণে আমাদের দলটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সকলেই নিজ-নিজ ইচ্ছামত পথের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছিলাম।

মোরনালা হইতে প্রায় তিন মাইল আসার পর আমরা সদ্য প্রস্তুত পথে পদার্পণ করিলাম। এ পথটি পুরাতন পথের চেয়েও সঙ্কীর্ণ, এবং কোনো কোনো স্থানে মাটি এমন আল্‌গা যে, প্রাণটি হাতে করিয়া চলিতে হয়। তাহা ছাড়া, পথের পার্শ্বে গাছ-পালা না থাকায় রৌদ্র হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। প্রখর সূর্যকিরণে আমরা ঈষৎ কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম।

এক জায়গায় একটা অর্ধভক্ষিত এবং কতকটা সদ্যভক্ষিত গোমুণ্ড দেখা গেল। যে প্রাণিগণের দ্বারা গরুটির অবশিষ্ট অংশের সদ্ব্যবহার হইয়াছিল, তাহাদের নাম ধাম আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হইতে আমাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। মৃত গরুর মতো জীবন্ত প্রমাণ সত্ত্বেও প্রাণীবিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করে, এমন অবিশ্বাসী আমাদের মধ্যে একজনও ছিল না। পরন্তু এমন দুই-একজন সাবধানী ও বিবেচক লোকের পরিচয় পাওয়া গেল, নিকটস্থ ঝোপঝাড়ের মধ্যেই যাঁহারা গোখাদকগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে লাগিলেন;—এমন কি তাঁহাদের প্রখর নাসিকার মধ্যে প্রমাণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমাদের একজন ভৃত্য ঈষৎ ত্বরিত পদে আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাঘ!"

"বাঘ? কোথায়?"

"একেবারে পথের মাঝখানে! পথের উপর দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। ললিতবাবুও দেখেছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"আজ্ঞে, তিনি বাঘ খুঁজতে বাঘের পিছনে পিছনে গিয়েছেন।"

কি সর্বনাশ! বাঘের পিছনে পিছনে গিয়েছেন? হাতে বন্দুক নাই, তলোয়ার নাই, মাত্র একটা লাঠি সম্বল করিয়া বাঘের পিছনে যাওয়া,—এ যে গোঁয়াতুর্মিরও অতিরিক্ত ব্যাপার। এই অবুঝ, উৎসাহশীল অর্ধবৃদ্ধ মানুষটিকে লইয়া আমাদের পথ-চলা অসম্ভব হইবে দেখিতেছি! ললিতবাবুর কথা ভাবিয়া দুশ্চিন্তায় আমরা আকুল হইয়া উঠিলাম। মানসনেত্রে আমরা স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম, নখে ও লাঠিতে একটা ভয়াবহ যুদ্ধ চলিয়াছে। হয়ত এতক্ষণে ললিতবাবুকে পিঠে ফেলিয়া নরখাদক গভীর অরণ্যে প্রবেশই বা করিল।

গুরুতর বিপদ হইতে বিপন্নকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের মন অধীর হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে আমরা অগ্রসর হইলাম। সম্মুখেই একটা ভীষণ ব্যাঁক। ব্যাঁকের মাথায় উপস্থিত হইলেই অকুস্থল এবং হয়ত বা এমন-একটা নিদারুণ দৃশ্য, যাহা কল্পনা করিতেও দেহ শিহরিয়া উঠে, চোখে পড়িবে! কিন্তু হরি! হরি! কোথায় বা বাঘ, আর কোথায়ই বা ভয়াবহ যুদ্ধ! ব্যাঁকের মাথায় উপস্থিত হইয়া দেখি সুস্থ দেহে (সবল মনে কি-না বলিতে পারি না) ললিতবাবু পাহাড়ে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। বাঘের নখ বাঘের থাবায় এবং ললিতবাবুর লাঠি ললিতবাবুর হাতে নির্বিরোধে বিরাজ করিতেছে।

ললিতবাবুর মুখে বাঘের বিবরণ শুনিয়া মনের মধ্যে খট্‌কা বাধিল।

মৃদুভাবে তাঁহার উপর জেরা আরম্ভ হইতেই সন্দেহ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাঘটার আকার একটা বড় বনবিড়ালের মতো দেখাইতেছিল, সে কিন্তু নিশ্চয়ই দূরত্বের জন্য ; নিকট হইতে দেখিলে অবশ্য একটা বড় বাঘের মতোই দেখাইত। প্রমাণ,—সূর্য যৎপরোনাস্তি বৃহদাকার বস্তু, কিন্তু দূরত্বের জন্য একটি রেকাবের মত প্রতীয়মান হয়। অতএব বাঘ হইয়াও যখন বিড়ালের মতো দেখাইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই বহু দূরেই অবস্থান করিতেছিল ; এবং বহু দূরে অবস্থান করিয়া যখন বিড়ালের মত দেখাইতেছিল তখন নিশ্চয়ই বাঘ।

পূর্বেই সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বাঘের গাত্র হইতে তীব্র বোট্‌কা গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। সাক্ষী বোধকরি কোনো প্রকার প্রমাণাভাব সমীচীন মনে করেন নাই। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, দূরত্ব এবং দুর্গন্ধ উভয়কে পাশাপাশি স্থাপন করা কঠিন ব্যাপার, তখন বিরক্ত ললিতমোহন অবিশ্বাসীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস যখন করবেন না, তখন আপনাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই।".

এ কথার উত্তরে অবিশ্বাসীদের মধ্যে একজন বলিল, "বিশ্বাসে মিলয়ে ব্যাঘ্র, তর্কে বহু দূর !" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা অবলম্বন করিয়া আর একজন বলিল, "ঐ বুঝি বাঘ গরজে ! বন মাঝে কি মন মাঝে !"

মিলিত কণ্ঠের সমুচ্চ হাস্যরবে পাহাড়-পর্বত চকিত হইয়া উঠিল।

বস্তুতঃ কোনো বাঘ কাছাকাছি থাকিলে এই অট্টহাস্যের নির্ঘোষে নিশ্চয়ই কিছুদূরে গিয়া বসিয়াছিল। বাঘের ভয়, গলিয়া গিয়া, কৌতুকের গাঢ় রসে পরিণত হইল।

নূতন রাস্তা শেষ করিয়া পুরাতন পথে পড়িয়া গাছ-পালা পাইয়া প্রখর সূর্যকর হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইলাম। তখন বেলাও দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ ঝরণার ধারে ছায়াশীতল স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রামের জন্য সকলে বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম

করার পর সঙ্গের খাদ্যদ্রব্যে ক্ষুধা ও ঝরণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া পুনরায় গন্তব্যাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর একদল শিকারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমরা শিকারের ফল কি হইল জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম, ভাগ্য তাহাদের প্রসন্ন নহে,—মাত্র একটি ছোট ভল্লুক এবং কয়েকটি হরিণ মারিতে পারিয়াছে, বাঘের দেখা পায় নাই।

বাঘের পূর্বপুরুষের পুণ্যের প্রভাবে দেখা পায় নাই। মানুষ বাঘ-ভল্লুককে হিংস্র জন্তু বলে; কিন্তু অকারণ যাহারা বনের নিরীহ অধিবাসী হরিণদিগকে বন্দুকের গুলিতে বধ করে, তাহাদিগকে কি বলা উচিত সে বিষয়ে বোধকরি মানুষের অভিধান নির্বাক।

বেলা তিনটার পর আমরা দেবীধূরা ডাকবাংলা হইতে দুই মাইল দূরবর্তী একটি স্থানে উপনীত হইলাম। সেখান হইতে দেবীধূরা উৎকট দুরারোহ চড়াই। পথের যেটুকু অংশ দেখা যাইতেছিল তাহার কষ্ট ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম,—এ যেন স্বর্গে প্রবেশ করিবার পূর্বে চরম পরীক্ষার সোপান। বেশ বুঝিলাম, মাইল দুই পথ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সহিত আমাদের দৈহিক ওজনের একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিবে। মাতা ধরিত্রী সহজে তাঁর সন্তানদিগকে স্নেহের কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে দিবেন না।

যাহা হউক, যাহা অনিবার্য তদ্বিষয়ে নিষ্ফল চিন্তা না করিয়া আমরা পর্বতারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। দুইখানি ডাণ্ডি ছিল, তাহাতে দুইজনের ব্যবস্থা হইল, দু-চারজন পদব্রজে যাইতে সম্মত হইলেন; যাঁহারা ঘোড়ায় চড়িতে পারেন, তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িলেন; আর যাঁহারা পারেন না, তাঁহাদের মধ্য হইতে নিরীহ অনিচ্ছুক দুইজনকে বাছিয়া লইয়া বহু প্ররোচনায় প্রোৎসাহিত করিয়া চড়ানো হইল। সে দুই-জনের মধ্যে লেখক একজন; অপরজন চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা বেবি,

অর্থাৎ কল্যাণী দেবী। হাঁটিয়া যাইলে আমাদের কষ্ট হইবে, সেই অজুহাতে কিছুতেই আমাদের হাঁটিয়া যাইতে দেওয়া হইল না। বলা বাহুল্য, এই হাঁটিয়া না যাওয়ার আরাম হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য আমরা চেষ্টা-চরিত্রের ত্রুটি করি নাই, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছিল। স্নেহশীলেরা সযত্নে আমাদিগকে দুইটি ঘোড়ার উপর চড়াইয়া দিলেন; এবং আমরা নিজেদের দেহ ও অশ্বের পৃষ্ঠ একত্র রাখিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিলাম। স্নেহ ও মমতা যে সময় বিশেষে এমন ভয়াবহ ভঙ্গি ধারণ করিতে পারে, সে কথা পূর্বে জানা ছিল না।

অক্ষত জীবন্ত দেহ দেবীধুরার ডাক বাংলায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ একটা পুরস্কার দিব বলিয়া আমরা ঘোড়ার সহিসদের নিকট অন্যের অগোচরে প্রতিশ্রুত হইলাম। কথা হইল, আমরা পাহাড়ের দিকে থাকিব, এবং খডের দিক হইতে তাহারা আমাদের ঘোড়াকে ঠেলিয়া রাখিবে। কিন্তু কার্যকালে তাহা আদৌ ঘটিয়া উঠিল না। পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া চলিলে ঘোড়ার গায়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ের খোঁচ্ লাগে, ঘোড়া চলিতে চাহে না, বারংবার পাহাডের দিক হইতে ফাঁকার দিকে সরিয়া আসিতে চেষ্টা করে। অবিলম্বেই বুঝা গেল, এরূপ মতের বিরুদ্ধে বন্য পশুকে দুই মাইল পথ চালাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে, অগত্যা ঘোড়া নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী খডের দিক ঘেঁসিয়া পদচিহ্নের রেখা ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিল। ষোল আনা চুক্তিভঙ্গের ভয়ে আমার সহিস ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আগে আগে অগ্রসর হইল। কিন্তু এটুকু ব্যবস্থাও অদৃষ্টে টিঁকিল না। মুখে এরূপ আড়-টান লইয়া চলার অনভ্যস্ত ঘোড়া এই অপরিজ্ঞাত অস্বস্তি হইতে মুক্তি লাভের অভিপ্রায়ে বারংবার এপাশ-ওপাশ অথবা উপর-নীচে মুখ-টানাটানি আরম্ভ করিল। এই বিপজ্জনক পথে ঐকান্তিক সাবধানতার সহিত চলিবার জন্য ঘোড়ার পক্ষে যে ন্যূনতম মানসিক স্থৈর্য এবং একাগ্রতার

প্রয়োজন, বুঝা গেল তাহাতেও বিঘ্ন উৎপাদন করা হইতেছে। সুতরাং ঘোড়ার মুখকে নিরুপদ্রব করিতে হইল; এবং নিরুপায়-আমি সম্পূর্ণ ভাবে দৈবের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া লাগাম ধরিয়া ঘোড়ার পিঠের উপর নীরবে বসিয়া রহিলাম।

মনে মনে খতাইয়া দেখিলাম, মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পড়ে। অবস্থা চতুর্দিক হইতে আটঘাট বাঁধিয়া বেশ গুছাইয়া আসিয়াছে, বাকি শুধু ঘোড়ার পদস্খলন! ঘোড়া খুব শান্ত, এবং এ পর্যন্ত কোনোদিন পাহাড় হইতে পড়ে নাই বলিয়া পুরস্কারের লোভে সহিস পুনঃপুনঃ আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিল। সহিসের উপর আমি অতিশয় চটিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু নিরাপদ গতির পক্ষে শুধু ঘোড়ারই নহে, সওয়ারেরও স্থৈর্যের একান্ত প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করিয়া মনের আক্রোশ মনে চাপিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

যাহা হউক, দুই মাইল পথ কোনো প্রকারে দৈবের আনুকূল্যে নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া আমরা দেবীধুরার ডাক-বাঙলায় উপনীত হইলাম। তখন কিন্তু আর ঘোড়া হইতে নামিতে চাহি না! ডাক-বাঙলার খড্‌হীন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থান করিয়া নিজেকে একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। বাঙলার প্রাঙ্গণ হইতে চতুর্দিকের অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখিয়া আমরা স্থির কবিলাম, অন্ততঃ দিন-দুই তথায় অতিবাহিত করিতে হইবে, পরদিনই চলিয়া যাওয়া হইবে না। একমাত্র পিউড়া ভিন্ন প্রকৃতির এমন বিশাল-মধুর সমারোহের সমাবেশ, এবং ডাকবাঙলার এমন শান্ত-সুন্দর অবস্থিতি মায়াবতীর পথে আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই নাই।

দেবীধূরার ডাকবাঙলা সমুদ্রস্তর হইতে ৬৮২৫ ফুট উচ্চ। শুধু দৃশ্য হিসাবেই নহে, আরও অন্যান্য কারণে দেবীধূরা একটি দেখিবাব উপযুক্ত স্থান। সেদিন কিন্তু আমরা বাঙলার প্রাঙ্গণ হইতে তুষার পর্বতের উপর অস্তগামী সূর্যের অপরূপ লীলা দেখিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

পরদিন প্রাতে চা পানের পর আমরা স্থান পরিদর্শনে বাহির হইলাম। বাঙলা হইতে নীচে নামিয়াই রাস্তা, এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকানের শ্রেণী। দোকানের মধ্যে অধিকাংশই পরিধেয় ও শীতবস্ত্রের দোকান। ভীমতাল ও আলমোরা ভিন্ন এতগুলি দোকান আর কোনও চটিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। নিকটবর্তী অনেকগুলি গ্রামের অধিবাসী দেবীধূরার এই দোকানগুলি হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করে।

বাজার অতিক্রম করিয়াই আমরা একটি অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটি কাষ্ঠনির্মিত বৃহৎ দোলনা দেখিতে পাইলাম। দুইটি বিশাল ও বহু-উচ্চ কাষ্ঠ মাটি হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার দুই উর্ধ্ব প্রান্ত আর-একটি মজবুত কাষ্ঠের দ্বারা সমভূমিক (horizontal) ভাবে সংযোজিত। এই সমভূমিক কাষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে দুইটি মজবুত রজ্জু নিম্ন দিকে নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের শেষ প্রান্তে লৌহনির্মিত একটি করিয়া

চাকা বাঁধা। এই হইল দোলনা। দেবীধুরায় এই দোলনাগুলিকে হিন্দোলা বলে। ভাদ্র পূর্ণিমার সময়ে এখানে আট দিন ধরিয়া মেলা বসে। সেই মেলার সময়ে আমোদ-প্রমোদের নানাবিধ ব্যবস্থার মধ্যে দোলনা দুটিও আনন্দ বিতরণের একটা বিশিষ্ট উপায়রূপে আন্দোলিত হইতে থাকে।

এ অঞ্চলে পাথর খেলা নামে একপ্রকার খেলা প্রচলিত আছে। খেলাটি যেমন উত্তেজনাপ্রদ, তেমনি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বৈরী দল নিজ নিজ শিবিরে রাশি রাশি পাথরের টুকরা সংগ্রহ করে। তাহার পর সেই পাথরের টুকরা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া উভয় দল পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে থাকে। তখন-আর কাহারও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, উন্মত্ত হইয়া কেবল মার মার শব্দ এবং পাথর ছোঁড়াছুড়ি। কালক্রমে উভয় পক্ষে বহু ব্যক্তি আহত হইয়া পড়ে; এমন কি কখনো-কখনো এক-আধ জন হত হইতেও শুনা যায়। এইরূপে যে-দল অপর দলকে পশ্চাতে হটাইয়া বিপক্ষ দলের শিবির দখল করিতে সমর্থ হয়, তাহাদেরই কণ্ঠে বিজয়মাল্য পড়ে। ভাদ্র পূর্ণিমার দিন বিশেষ সমারোহের সহিত দেবীধুরায় এই খেলা হইয়া থাকে, এবং বিজয়ী দল সমাগত দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে বিশেষ সম্মান এবং সমাদর লাভ করে।

দোলনা দুটির নিকট একজন স্থানীয় লোকের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। আলাপের সূত্রপাতেই বুঝিলাম সে ব্যক্তি প্রদর্শক, অর্থাৎ গাইড (guide)। আমাদেরও একজন প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। যাহা কিছু দর্শনীয়, একজন পাণ্ডার সাহায্যে দেখিতে পারিলেই ভাল হয়।

দোলনা দুটির কিয়দ্দূরে কয়েকটি প্রস্তর-মূর্তি দেখিলাম। মূর্তিগুলি বুদ্ধমূর্তি ও হনুমান মূর্তি বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ বিচিত্র সমাবেশ কি করিয়া ঘটিল, তাহা আমরা কোনো প্রকারেই নিরূপণ

করিতে পারিলাম না। নির্বাণের নিদিধ্যাসন এবং উল্লম্ফনের চপলতা কিরূপে এরূপ পাশাপাশি ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে, তাহার যুক্তি আবিষ্কারে অসমর্থ হইলাম। অবশ্য হনুমান যদি নিদিধ্যাসনের সম্মুখে জোড়হস্তে স্থির হইয়া থাকে ত' স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেরূপ আচরণ করিতে হনুমানকে ত' একমাত্র রামচন্দ্রের সভাকক্ষেই দেখা যায়; আর রামচন্দ্রই হনুমানের অদ্বিতীয় প্রভু।

মূর্তিগুলির খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ের উপর পাঁচখানা চতুষ্কোণ কক্ষ। শুনিলাম, এ কক্ষগুলি সাধু অতিথিগণের আশ্রমরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে আমরা ছয় জন সাধুকে সাধনায় উপবিষ্ট দেখিলাম। সাধুসঙ্গ করিবার জন্য মনের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও সময় এবং সুবিধার অভাবে সে বাসনা পবিত্যাগ করিতে হইল।

এই আশ্রমগুলির সন্নিকটেই একটি বৃহৎ দেওদার বৃক্ষ। গাইড মহাশয় বলিলেন, বৃক্ষটি অতিশয় প্রাচীন। কুমাউনরাজ শ্রীমান জগচ্চন্দ্র এই দেওদার বৃক্ষতলে বসিয়া বারো বৎসর নিরন্তর কঠোর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বোধ করি তাঁহার সাধনায় প্রসন্ন হইয়া দেবী তাঁহাকে সিদ্ধি দান করেন; তদবধি স্থানটিব নাম দেবীধূরা। দেওদার বৃক্ষটি যে অতিশয় পুরাতন, তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আমাদের অনুমানের চেয়েও সেটি যে আরও অনেক অধিক পুরাতন, তাহা পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস করিয়া লইয়াই নিরস্ত হইতে হয়।

একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। দেওদার বৃক্ষ শুনিয়া কেহও যেন আমাদের দেবদারু গাছ মনে করিবেন না। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ,—পাহাড়ের অত্যুচ্চ প্রদেশে জন্মিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডিকা দেবীর মন্দির দেবীধূরার একটি বিশিষ্ট স্থান। মন্দিরেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাহাড়িগণ কর্তৃক বরাইচণ্ডিকা নামে অভিহিতা। শুনিলাম, এমন জাগ্রত দেবতা এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই।

পাহাড়িগণের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ইষ্টানিষ্ট সকলই দেবীর কৃপা ও ক্রোধের উপর নির্ভর করে।

চণ্ডিকা দেবীর মন্দির পর্বতগুহার নিভৃত আশ্রয়ে নিহিত। গুহার ভিতরে ঘণ্টি ঝুলিতেছে; সেই ঘণ্টি বাজাইয়া ভক্তগণ দেবীর সংবর্ধনা করেন। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, দেবীর দ্বিভুজা মূর্তি সুবর্ণ দিয়া গঠিত। মূর্তি দর্শন করা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। দেখিলে দর্শনকারীর অমঙ্গলের সীমা থাকে না। এমন কি, পূজারিগণও স্বর্ণমূর্তি দর্শন করে না,—পূজা করিবার সময়ে চোখ বাঁধিয়া পূজা করে।

বরাইচণ্ডিকার মন্দির বিশেষ ভাবে দর্শনীয় বস্তু। দুইটি সুবৃহৎ কঠিন প্রস্তর পাশাপাশি পরস্পরকে চাপিয়া রাখিয়াছে,—মধ্যে দরজার মত সামান্য অবকাশ। পার্শ্বে গুহা; এবং গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতরে মন্দির। মন্দিরের মধ্যে দেবীর সুবর্ণপ্রতিমা। মন্দিরের ভিতর একটি গভীর পাতাল আছে—দেবী স্বয়ং সেই পাতালের মধ্যে অবস্থান করেন। এই পাতাল কত গভীর তাহা কেহও জানে না। প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বহু লোক মিলিত হইয়া এই পাতালের ভিতর ঘড়া ঘড়া জল ঢালে। যে বৎসর পাতাল পূর্ণ হইয়া যায়, সে বৎসর যথোপযুক্ত বর্ষা হইয়া থাকে। না ভরিলেই সমূহ অমঙ্গলের কথা, অনাবৃষ্টি ও অজন্মার দ্বারা সে বৎসর মানুষের দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের সীমা থাকে না।

ডাকবাঙলার পূর্বদিকে অতি নিকটেই এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পাহাড়িগণ এই দেবতার নাম রাখিয়াছে এরিমল। দেবতার একপ নাম শুনিয়া আমরা বিস্মিত এবং একটু ব্যথিত হইলাম। টোডরমল, সূর্যমল প্রভৃতি মানুষের নামই শুনিয়াছি, দেবতার নাম এরিমল হইতে পারে, এ ধারণা পূর্বে ছিল না। শুনিলাম, ভাদ্র পূর্ণিমার দিন বরাইচণ্ডিকার স্বর্ণ-প্রতিমা পেটরাবদ্ধ হইয়া এরিমলের নিকট বেড়াইতে আসেন। আবার সেই দিনই নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরের নিকটেই একটি সুবৃহৎ শিলাখণ্ড,—নাম রণশিলা। রণশিলার পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত সমতল এবং চতুষ্কোণ। পাথরটির মধ্যস্থল ভেদ করিয়া একটি সরল ফাটলের রেখা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর চলিয়া গিয়াছে। প্রবাদ, ভীমসেন নিজ তরবারি দিয়া এই বৃহৎ এবং কঠিন প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, ফাটলেব রেখা তাহারই চিহ্ন। এ সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। পাঠকের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন ভীমসেনের সহিত দেবী বরাইচণ্ডিকা এই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। সেই সময়ে কোনো এক সওদাগর একশত জাহাজ লইয়া লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সমুদ্রে ভীষণ ঝটিকা উঠিল। ঝড়ে একশত জাহাজ ডুবিবার উপক্রম করিলে সওদাগর বিশেষ ভাবে দেবীর স্তব-স্তুতি করিলেন, এবং অঙ্গীকৃত হইলেন, বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে সওয়া লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দেবীব পূজা দিবেন। সওদাগরের কাতর প্রার্থনায ও লোভনীয় প্রস্তাবে দেবী সদয় হইলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া সওদাগরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। হস্ত প্রসারিত করিবাব সময়ে দেবীর হস্ত হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

বিস্মিত ভীমসেন কোথা হইতে জল ঝরিল জানিতে চাহিলেব। দেবী কিন্তু কোনো মতেই তাহা প্রকাশ করিলেন না। তাহাতে ভীমসেনের ক্রোধের সঞ্চার হইল, এমন কি, তিনি দেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কে বলে মা তুমি অবলে' লিখিলে কি হইবে? হাজার হউক, আসলে ত' অবলা। ভীমসেনের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখিয়া দেবী প্রমাদ গণিলেন; যুদ্ধে ভীমসেনের সহিত পারিয়া উঠা কঠিন হইবে। তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সজোরে ধূলির উপর হাত চাপড়াইলেন। তাহাতে ভীমসেনের দুই চক্ষে ধূলি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য তিনি চক্ষু লইয়া বিব্রত হইয়া

পড়িলেন,—এবং সেই সুযোগে দেবী পাতালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। তাড়াতাড়ি দুই চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ভীম চাহিয়া দেখিলেন, দেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, দেবী নিশ্চয়ই পাতালের মধ্যে লুকাইয়াছেন, সেই জন্য কাল বিলম্ব না করিয়া পাথরের উপর তরবারির এক কোপ বসাইয়া দিলেন। অমন সুন্দর-ক্রীড়াস্থলের মসৃণ সমতল পাথরখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া ভীমসেনের মনে অনুতাপ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি আর একখানা গুরুভার পাথর লইয়া ফাটার উপর বসাইয়া দিয়া দুই খণ্ড প্রস্তরকে একত্রে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রমাণ স্বরূপ, আজ পর্যন্ত সেই পাথরটি ঠিক তেমনি ভাবে ফাটলের উপর বসানো আছে, এবং পাথরের উপর পাশা খেলার ছক ও দেবীর পঞ্চাঙ্গুলীর ছাপ আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

অবিশ্বাসিগণ এগুলিকে পাণ্ডাগণের সৃষ্টি, এবং লোক ঠকাইবার কৌশল বলিয়া ব্যক্ত করেন, বিশ্বাসিগণ সে কথা হাসিয়া উড়ান। সত্য মিথ্যার জটিল অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না; কিংবদন্তিকে কিংবদন্তির রঙেই রঞ্জিত দেখা ভাল। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না, সেই বিস্তৃত ও বিশাল রণশিলার দুই-প্রান্ত-বিস্তৃত গভীর ফাটল ও তাহার উপরে অবস্থিত বিরাট প্রস্তরখণ্ড দেখিলে কিংবদন্তির অসম্ভাব্যতা গভীর বিস্ময়ের মধ্যে খানিকটা যেন নিমজ্জিত হইয়া যায়। পাশার ছক এবং পঞ্চাঙ্গুলীর ছাপকে নিমেষের মধ্যে বাতিল করা যায়, কিন্তু সেই গভীর ও দীর্ঘ সরল রেখার ফাটল এবং তদুপরি স্থাপিত সেই বিশাল পাথর মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত ব্যাপার। অবিশ্বাস সেখানে মুহূর্তের জন্যও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়।

রণশিলার পর আরও দুই-একটি মন্দিরাদি দেখিয়া আমরা ডাকবাঙলায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। ফিরিবার পথে এক শিকারির সহিত আমাদের আলাপ হইল। তাহার মুখে শুনিলাম, দেবীধূরার

খুব নিকটবর্তী অরণ্যে বাঘ, ভল্লুক ও জড়ায়ু পাওয়া যায়। হরিণ ও মহিষের মাঝামাঝি এক প্রকাণ্ড জন্তু এই জড়ায়ু। মহিষের দেহে হরিণের শিং লাগাইয়া দিলে অনেকটা জড়ায়ুর মতো দেখিতে হয়। শিকারি আমাদিগকে শিকারে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপিড়ি করিতে লাগিল। বলিল, সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাঘ, ভল্লুক ও জড়ায়ুর নিকট পেঁাছাইয়া দিবে। কিন্তু, পক্ষান্তরে বাঘ, ভল্লুক ও জড়ায়ু পাছে আমাদিগকে আরও কিছুদূরে পেঁাছাইয়া দেয়, সেই কথা চিন্তা করিয়া আমরা তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম না। এত কষ্ট করিয়া মায়াবতীর এত কাছে আসিয়া দেবীধূরার অরণ্যে পথের ছেদ টানিলে পরলোকে গিয়াও স্বস্তি পাওয়া যাইবে না। শিকারে অসম্মতি জানাইয়া আমরা ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে আহারাদি সমাপন করিয়া পরবর্তী চটি দশ মাইল দূরবর্তী ধূনাঘাটের জন্য আমরা রওয়ানা হইলাম।

৩০

দেবীধূরায় দুইদিন অবস্থান করার ফলে আমাদের দ্রব্যাদি ও ডাণ্ডিগুলি পেঁৗছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যথোপযুক্ত কুলি সংগ্রহ না হওয়ায় সব ডাণ্ডিগুলি ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং কাহাকেও কাহাকেও ঘোড়ার আশ্রয় লইতেও হইবে।

দেবীধূরার পথে মাইল দুই অশ্বারোহণ করিয়া মনের মধ্যে এমন সাহস এবং আত্মপ্রতীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, অপরের অনুরোধ অথবা সহায়তা ব্যতীত আমি নিজে-নিজেই একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলাম। সহানুভূতিশীল পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন, এবার সহিসের সহিত কোনো প্রকার আত্মাবমানসূচক চুক্তিতে আবদ্ধ হই নাই, এবং প্রথম হইতেই নিজ হস্তে লাগাম লইয়া ঘোড়া চালাইয়া দেবীধূরা হইতে ধুনাঘাট দশ মাইল পথে আত্মনির্ভরতার নিশ্ছিদ্র দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

পাহাড়ের পথে ঘোড়ায় চড়িবার যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন, চড়াইয়ের মুখে ঘোড়ায় চড়া যত সহজ নাবাইয়ের মুখে তত নহে। নাবাই খুব বেশী ঢালু হইলে ঘোড়ার পিঠের উপর নিজেকে খাড়া রাখা, শুধু আমার পক্ষেই নহে, আমার অপেক্ষা দক্ষতর সওয়ারের পক্ষেও কঠিন কার্য। ধুনাঘাট পর্যন্ত গোটা কতক উৎকট নাবাইয়ের মুখে আমাকে ঘোড়া হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'মিঠা' নাবাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আমি অবতরণ না করিয়া ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় থাকিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইতেছিলাম। ভবতি দক্ষতমঃ ক্রমশো জনঃ। মানুষ ক্রমশই দক্ষ হ'য়ে ওঠে, আমার দক্ষতা কিন্তু মন্থর পদে না এসে ত্বরিত গতিতেই আসছিল।

কাঠগুদাম হইতে এ পর্যন্ত কুলিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত অধিকাংশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছিলাম, দেবীধূরা হইতে রওয়ানা

হইবার সময়ে আরও একটু বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আমাদের সেই বিস্ময় বাড়িয়া গেল। যে দুইজন পূজারী আমাদিগকে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির দেখাইয়াছিল ও প্রসাদী ফুল দিয়াছিল, দেখিলাম তাহারা দুইজনেও মোট বহিবার কুলিদের মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে! একই ব্যক্তিকে দেব-সেবক ও মোটবাহকরূপে পাইয়া আমাদের মনে বিস্ময়কে ছাপাইয়া একটা সবিরক্তি ঘৃণা উদ্রিক্ত হইল। আমরা স্থির করিলাম আমাদের গোটা-দুই জিনিষ পড়িয়া থাকে তাহাও স্বীকার, এ দুইজন পূজারীকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে। পদমর্যাদার উচ্চস্তর হইতে এতটা অধঃপতনের কারণ অন্ততঃ আমরা নিজেদের হইতে দিব না। কিন্তু তাহাদের কাতর প্রার্থনায়, বিশেষতঃ সেই প্রার্থনার মেরুদণ্ড স্বরূপ সবল যুক্তিবত্তায়, আমরা মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলাম। তাহারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, আত্মমর্যাদা বাঞ্ছনীয় বস্তু বটে, কিন্তু অন্ন শুধু বাঞ্ছনীয়ই নহে, অপরি-হার্যও। দেবতা যখন সেই অপরিহার্য বস্তুর যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন মানুষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কোথায়? এত বড় কঠিন সত্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেই হইল।

অপরাহ্নকালে আমরা ধূনাঘাটের ডাকবাংলায় পেঁ ৗছিলাম। এ ডাকবাংলাটি দেখিয়া আমাদের মন তেমন প্রসন্ন হইল না। প্রথমতঃ, ডাকবাংলাটি ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন মনে হইল; দ্বিতীয়তঃ, ডাকবাংলার চতুর্দিকে ঘননিবদ্ধ চিড় বৃক্ষের পর্দা থাকায় দূরের দৃশ্য দেখিবার কোনো উপায় ছিল না। তাহার উপর শুনা গেল, পাইন গাছের হাওয়া কাশ রোগের পক্ষে উপকারী বলিয়া ধূনাঘাটের বাংলায় অনেক যক্ষ্মা রোগী আসিয়া বাস করে।

আমরা যেদিন ধূনাঘাটে পেঁ ৗছিলাম সেদিন মহানবমী। নবমীর দিন প্রতি বৎসর ধূনাঘাটে মেলা বসে। বহু দূর-দূরান্তরের গ্রাম হইতে, এমন কি বিশ-পঁচিশ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এ মেলায় জনসমাগম হয়।

আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন মেলা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। দলে দলে লোক গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। কাহারো হাতে কম্বল, কাহারো হাতে কাটারি; কাহারো মুখে বাঁশি, কাহারো মুখে গরম-ভাজা পাঁপর; কেহও বেচিতে বেচিতে চলিয়াছে, কেহও দর করিতে করিতে। বৃদ্ধেরা সাবধানে চলিয়াছে, যুবকেরা দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা ছেলেদের হাত ধরিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। সকলেরই মুখে হাসি ও আনন্দ; সকলেরই হাতে মেলায় খরিদ করা জিনিষপত্র।

ডাকবাংলার বারান্দায় বসিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে করিতে আমরা এই জীবন্ত ও চলন্ত চিত্র উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে নর্তকীর বেশে সজ্জিতা দুইটি তরুণী আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সঙ্গে দুইটি পুরুষ, একজনের হস্তে একখানা সারেঙ্গ, অপরের হস্তে বাঁয়া তবলা।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চাও তোমরা ?"

দ্বিতীয়বার আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া তাহারা জানাইল, যদি আমরা ইচ্ছা করি ত' নৃত্যগীতের দ্বারা তাহারা আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের সহিত অল্প কয়েকটা কথা কহিয়া বুঝিলাম, আমরা ইচ্ছা না করিলেও তাহারা আমাদের চিত্তের বিনোদনই হউক অথবা বিরোধনই হউক, যাহা হয় একটা কিছু করিবেই; এবং তাহাদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করিলে সময় ও মেজাজ নষ্ট ভিন্ন আর কোনো ফল হইবে না। আমাদের মৌন সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া তাহারা জমাইয়া বসিয়া পড়িয়া পুরাদস্তুর গানবাজনা আরম্ভ করিল।

বাইজী দুইজন বিচিত্র অঙ্গবিলাস সহকারে গান ধরিল,—"পিয়ো পিয়ো মেরো রাজা, বোতলমে রঙ্গি সরাব।"—এই এক ছত্র ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্ততঃ বার কুড়িক তাহারা গাহিল।

বেচারা রাজাকে রঙ্গিন সরাব পান করিবার জন্য কে এমন ভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছে তাহার মর্মভেদ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। গানের অন্তরায় রাজার প্রতি আরও কি ব্যবস্থা হয় জানিবার জন্য আমরা সকৌতূহলে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অন্তরা শুনিয়া প্রহেলিকা আরও দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল!

এয়সা পিয়ো য্যায়সা বারে বজে কা দৌড়।
চল্ বেটা সরাররারররা দম্ দম্ দম্
তাজে ও বাসি, মিঠা ও খট্টা
কেয়া কেয়া দেখাতি বহার!
পিয়ো পিয়ো রজা, বোতলমে ব্রাণ্ডি সরাব।

কে যে 'রাজা' এবং কে যে 'বেটা',—এবং সুরা পান করাইবার জন্য কাহার যে এই আকুল অনুরোধ, আমরা তাহা কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলাম না। শুধু এইটুকু বুঝা গেল যে, মত্ততার মাত্রা এমন হওয়া চাই যাহাতে অন্তত পরদিন বারোটা পর্যন্ত তাহার দৌড় চলে। সুদূর হিমালয়ের অতি-নিভৃত প্রদেশে পাহাড়ি বাইয়ের মুখে ব্রাণ্ডির উল্লেখ শুনিয়া আমাদের মন কৌতুকে ভরিয়া উঠিল।

গান শুনিয়া আমাদের মনে প্রশংসার অপেক্ষা পুলকের সঞ্চার অধিক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বাইজীগণ আমাদিগকে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অবকাশ না দিয়া পুনরায় গান ধরিল,—

শুন বাঁকে পগড়িয়াবালে,
তেরে পগড়িমে কৈসে ফুল ডালে!
শুন বিরজকে রাজদুলারে,
তেরে কাঁকুলকে পেঁচ নিরালে!
তেরে বনশি বজে মৎওয়ালে,
শুন বাঁকে পগড়িয়াওয়ালে!

আমরা কেবল এ গানের মর্মোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম তাহাই নহে, গানটির সুরের মিষ্টত্ব ও ভাবের কোমলতা আমাদিগকে তৃপ্ত করিল। শ্রীরাধিকার কোনও সখী ব্রজরাজদুলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—হে বঙ্কিমচূড়াধারী, তোমার বাঁকা চূড়ায় কেমন করিয়া আমরা ফুল স্থাপন করিব তাহাই ভাবিতেছি। হে ব্রজরাজদুলাল, তোমার কুন্তলের বক্রতা অপরূপ,—এবং তোমার বাঁশরীও আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া বাজিতেছে। মাত্র এইটুকু ত' গান,—কিন্তু কথা ও সুরের মণিকাঞ্চনের যোগে ভারি শ্রুতিমধুর।

গান থামিলে গায়িকাগণ পুরস্কার পাইয়া প্রসন্নমুখে প্রস্থান করিল,—আমরাও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলাম।

সমুদ্রস্তর হইতে ধূনাঘাট বাংলার উচ্চতা ৫৯০০ ফুট। বাংলাটি অপর বাংলাগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। শয়ন-কক্ষ মাত্র দুইটি,—আসবাবপত্রও তেমন সুবিধাজনক নহে। যাহা হউক, আমাদের একরাত্রি বাসের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ধূনাঘাটের পরেই আমাদের গন্তব্য স্থান মায়াবতী, দূরত্ব মাত্র আট মাইল। প্রভাতে উঠিয়াই আমরা দেখিলাম মায়াবতীর আতিথ্য আট মাইল অগ্রসর হইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পোঁছিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আলমোরা হইতে আমাদের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিলেন; এদিকে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ মায়াবতী হইতে আমাদের জন্য লোকজন পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে বাকি পথটুকু অতিক্রম করিবার পক্ষে আমাদের আর কোনও অসুবিধা রহিল না। আহারাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে আমরা মায়াবতী রওয়ানা হইলাম।

স্কুলের কয়েকটি ছাত্র আমাদের ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তাহাদের মুখে বাঘ-ভালুকের ভয়াবহ বিচিত্র কাহিনী শুনিতে শুনিতে

আমাদের পথ চলার কৌতুক ও আনন্দ পুষ্টিলাভ করিতেছিল। শিশুকে যে-ভাবে ছেলে-ধরার গল্প বলা হইয়া থাকে, তাহারাও আমাদিগকে সেইরূপ বাঘ-ভালুকের গল্প শুনাইতেছিল। আমরাও অকারণ ভীতি এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহাদের পুলক ও উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতেছিলাম।

মধ্য পথে 'খতিখানা গ্রাম। এই গ্রামে একটি ইংরাজি হাই-স্কুল আছে। স্কুলের একজন শিক্ষকও পথের সাথী হইয়া আমাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য ধূনাঘাটে গিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে স্কুলটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

খেতিখানা একটি উন্নতিশীল গ্রাম। গ্রামের অধিবাসী ও শিক্ষকগণ গ্রাম ও স্কুলের উন্নতির জন্য অতিশয় যত্নবান। এ বিষয়ে মায়াবতীর সন্ন্যাসীগণও ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গ্রামের স্কুলটি বেশ চমৎকার, তৎসংলগ্ন বোর্ডিংটিও সুন্দর। পূর্ববর্তী কয়েক রাত্রি স্কুলে বিশেষ সমারোহের সহিত রামলীলা উৎসব হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা আমাদিগকে তাহার ভাঙ্গা আখড়া না দেখাইয়া ছাড়িল না।

খেতিখানা হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া ঢেরনাথের মন্দির। মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি একজন সাধুর তত্ত্বাবধানে আছে। এখানে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুদ্র ধর্মশালা দেখিলাম।

ঢেরনাথ হইতে কিছুদূরে আসিলে সন্ন্যাসিনীদের একটি আশ্রম দেখা যায়। সম্প্রতি চার-পাঁচজন সন্ন্যাসিনী এই আশ্রমে বাস করিতেছেন। শুনিলাম, এটি সাধুদের পুরাদস্তুর জেনানা-মহল, পুরুষের এ আশ্রমে প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, পুরুষ সাধুগণও এই সন্ন্যাসিনীগণের চক্ষে সংশয়াতীত নহেন।

কিছু পরে আমরা গোরচুঙ্গী নামে একটি নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রায় দুই মাইল পথ এই অরণ্যের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া আমরা মায়াবতীর সীমান্তে আসিয়া পেঁ ৗছিলাম। এখান

হইতেই মায়াবতীর ঘন শ্যামল কান্তি দেখিয়া আমাদের চোখ জুড়াইয়া গেল! এই দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ বাহিয়া কেন যে এখানে আশ্রম বাঁধা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ডাণ্ডি হইতে অবতরণ করিয়া বাকি পথটুকু আমরা হাঁটিয়া অতিক্রম করিলাম। মনুষ্যযানে সমাসীন হইয়া সমারোহের সহিত সাধুগণের আশ্রমে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করিয়া উৎসুক নেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে আমরা আমাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট Mother's Cot বাংলোয় উপনীত হইলাম।

এই পরিচ্ছন্ন মনোরম বাংলোটি মায়াবতীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থলে অবস্থিত। যে মহীয়সী আমেরিকান মহিলা ভারত ছাড়িয়া আমেরিকা যাইবার সময়ে সমগ্র মায়াবতী স্টেট রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া যান, তিনি এই বাংলোয় বাস করিতেন। মায়াবতী আশ্রমে তিনি 'মাদার' নামে সমাদৃত।

অতিথিগণের অবস্থানের জন্য এখানে নিকটেই একটি সুনির্মিত স্বতন্ত্র গৃহ আছে। সেই গৃহটিই সাধারণত অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ সম্মানার্হ অতিথির ক্ষেত্রে কখনো-কখনো 'মাদার্স কট' গৃহটি ব্যবহৃত হয়।

'মাদার্স কটে'র চতুর্দিকে মনোরম পুষ্পোদ্যান। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত অপূর্ব দৃশ্য,—এবং সেই অপরূপ দৃশ্যের পটভূমিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে সুনির্মল বিশাল চিরদেদীপ্যমান তুষারপর্বত। তখন অস্তরবির লোহিত কিরণজালে সমগ্র পর্বত গলিত স্বর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা নির্বাক হইয়া এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছিলাম আর ভাবিতে-ছিলাম, সার্থক হইয়াছে এই দুর্গম ও দুরারোহ পথের দশ দিনের পথ-শ্রান্তি,—সার্থক হইয়াছে এই দূর হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করা।

আমাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিল মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ ও অপর মহারাজগণের আগমনে। প্রজ্ঞানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্য আমার মনের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ছিল, কিন্তু সত্য কথা যদি বলি, উৎকণ্ঠাও ছিল

খানিকটা। এতটা বয়স পর্যন্ত যে বস্তুর সহিত পরিচয় হইল না, একমাত্র সেই প্রজ্ঞাতেই যাঁহার আনন্দ, আমি আমার অপ্রাজ্ঞতা লইয়া কি প্রকারে তাঁহাকে আনন্দিত করিব? অবশ্য নাম যে সব সময়েই স্বভাবের নির্দেশ দেয়, তাহা নহে, গোলাপকে যে-নাম ধরিয়াই ডাকা যাক না কেন, গোলাপ গোলাপই থাকে, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি নামের একটা প্রভাব আছে, সে কথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। হিসাব পরীক্ষা করিতে মলয়বাবু আসিতেছেন শুনিলে মনে মনে যতটা উদ্বিগ্ন হই, তদপেক্ষা কিছু বেশি হই ভৈরববাবু আসিতেছেন শুনিলে। অথচ কার্যতঃ হয়ত দেখা যায়, ভৈরবের মধ্যে 'মা ভৈ' রব যতটা বেশি, মলয়ের মধ্যে স্নিগ্ধতার স্পর্শ ঠিক ততটাই কম।

প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর নাম প্রজ্ঞানন্দ না হইয়া সহজানন্দ হইলে আমার মন হয়ত' অনেকটা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু স্বামীজীর সহিত দুই-চারটা কথাবার্তা আর দুই-চার মিনিট আলাপ-আলোচনা করিয়াই বুঝিলাম, নামে প্রজ্ঞানন্দ হইলে কি হয়, আসলে তিনি সহজানন্দই। প্রজ্ঞা বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করিয়া এমন সহজ হইয়াছেন যে, তাঁহার সহিত কোনো মালেরই কারবার করিতে বাধে না;—শ্রদ্ধার ত' নয়-ই,—বন্ধুত্বেরও নয়। অপর মহারাজগণেরও সহিত আলাপ করিয়াও আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে সকলের সহিত অপরিচয়ের সঙ্কোচ এবং ব্যবধান অন্তর্হিত হইল। সন্ন্যাসীগণকে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া গেল চা এবং আলাপ-আলোচনার মনোরম বৈঠক

এই বৈঠকেই গৌরচন্দ্রিকা হইল আমাদের বিশ-বাইশ দিবসব্যাপী মায়াবতী-যাপনের অতি বিচিত্র এবং মধুর পালার। কিন্তু যত বিচিত্র এবং মধুরই হউক না কেন, 'মায়াবতী পথের' মধ্যে সে পালার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং পথের শেষের সহিত আমার কাহিনীও শেষ করিলাম।

সমাপ্ত